কুসুমেষু

সুবোধ ঘোষ

প্রথম প্রকাশ
১লা আষাঢ়, ১৩৬৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফাল্গুন, ১৩৬৩

প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত
৩/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ-শিল্পী
সনৎ কর

নামপত্র
সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর
ননী মোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, অ্যাণ্টনী বাগান লেন
কলিকাতা-৯

দু'টাকা আট আনা

লেখকের অন্যান্য বই

ফসিল

পরশুরামের কুঠার

শুক্লাভিসার

গ্রাম যমুনা

মণিকর্ণিকা

জতুগৃহ

পুতুলের চিঠি

কিংবদন্তীর দেশে

ভারত প্রেমকথা

থির বিজুরী

তিলাঞ্জলী

একটি নমস্কারে

শতভিষা

গঙ্গোত্রী

ত্রিযামা

সুজাতা

অবৃত্ত পথযাত্রী

কুসুমেষু

গল্পসূচী—

এখানে নীহার আর ওখানে হেমা।

এখানে ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোড আর ওখানে দার্জিলিং-এর কার্ট রোড।

এখানে সিঁড়িতে বিকানীরের পাথর আর বারান্দায় পদ্ম-কাটা ইঁটের বড় বড় থাম, ব্যারাকপুরের 'ভবধাম'। আর ওখানে বাতাসার মত পাতলা মারবেলের ছোট ছোট টালি দিয়ে ছাওয়া আটকোণা বাংলো, দার্জিলিং-এর 'স্নিগ্ধা'।

এখানে ভবধামের অভিভাবিকা এক খুড়িমা দিনে চারবার লক্ষ্মী-নারায়ণের পুজা করেন। আর ওখানে স্নিগ্ধার অভিভাবক এক জেঠামণি দিনে দশবার পাঠ করেন আর্ট এণ্ড সায়েন্স অব এটিকেট।

এই ভবধামের ছেলে নীহারের সঙ্গে বিয়েও হয়ে গেল ঐ স্নিগ্ধার মেয়ে হেমার। এই বিয়ে হবারই ছিল। অনেকেই জানতো আর বলতোও, এই বিয়ে হবে। হওয়া উচিতও ছিল।

সুন্দর ছবি এঁকে এঁকে দিন কেটে যাচ্ছিল যে নীহারের, সেই নীহারই বিয়ে করলো হেমাকে, কলেজ ছাড়ার পর চার বছর ধরে শুধু এক সুন্দর ছবি হয়ে থেকে থেকেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল যে হেমা।

যা খুবই স্বাভাবিক, যা না হ'লে বরং খুবই খারাপ হতো, তাই হলো। কারণ, নীহার ভালবেসেছিল হেমাকে, আর হেমা ভালবেসেছিল নীহারকে।

ঘরভরা লোক, মাঝখানে গালিচা-পাতা ছোট একটি আসর। তার উপর বসেছিলেন বিয়ের রেজিস্ট্রার মিস্টার তালুকদার আর নীহার। পাশের ঘর থেকে এই উৎসবের ঘর, কতটুকুই বা ব্যবধান। কিন্তু এইটুকু পথও নিজের চেষ্টায় হেঁটে আসতে পারলো না হেমা। শেষ পর্যন্ত জেঠিমাই হেমার কাছে এগিয়ে যান, আর জেঠিমাই হেমাকে কোনরকমে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে গালিচা-পাতা আসরের উপরে তুলে দিয়ে যান।

মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক। জেঠামণি জানেন, জেঠিমাও জানেন, এইরকমই করবে হেমা। দেখে খুশিই হয়েছেন জেঠামণি আর জেঠিমা। দার্জিলিং-এর কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে

এই অতি শান্ত এক বাংলো বাড়ির ইচ্ছা রুচি আর রীতির স্নেহে গড়ে উঠেছে যে-হেমার পঁচিশ বছরের শীলশান্ত জীবন, সূক্ষ্ম এটিকেটে ময়্যালে আর কালচারে লালিত জীবন, সে-মেয়ে তার জীবনের একটা ঘটনার সমুখে এগিয়ে যাবার সময়ও হঠাৎ ব্যস্ত হ'য়ে উঠবে কেমন ক'রে? ব্যস্ত হওয়াই যে একটা রূঢ়তা।

স্নিগ্ধার ভিতর ও বাহির দুইই বড় বেশি স্নিগ্ধ। এখানে খাবার জল তিনবার ডিষ্টিল করা হয়, আর স্নানের জল একবার। চা খাবার আগে চাএর টেম্পারেচার একবার পরীক্ষা ক'রে দেখাও এ-বাড়ির নিয়ম। সকালবেলা ঠিক ন'টার সময় উপনিষদ নিয়ে পড়তে বসেন জেঠামণি, আর ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ন'টা পনর মিনিটের সময় জেঠামণির দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

সুন্দর নিয়মে আর সুন্দর শিক্ষায় অত্যন্ত শান্ত হয়ে আছে স্নিগ্ধার মেয়ে হেমারও মুখের হাসি, চোখের চাহনি ও নিঃশ্বাসের ছন্দ। এখানে মুখের ভাষা যেমন মার্জিত, ভাষার ধ্বনিও তেমনি মৃদু। কোন শব্দ এখানে দাপাদাপি করে না; স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের অনেক দিনের নিয়মে বাঁধা চিরমৃদুতার জীবনকে ভ্রূকুটি ও উচ্চহাসির উচ্ছ্বাস কখনো বিড়ম্বিত করে না। এই বাড়ির মনের কোন সাধ ইচ্ছা ও কল্পনা কখনো ব্যস্ততায় রূঢ় হয়ে উঠে না। ব্যস্ত হলেই মনের আগ্রহ ধরা পড়ে যায়, আর এইভাবে নিজেকে ধরা পড়িয়ে দিলে নিজের মধ্যে আর থাকে কি? যে মন ধরা পড়ে না, সেই মনই তো মন ভুলিয়ে দেয় সংসারের।

নিয়মের শাসনে নয়, নিয়মের স্নেহে সুন্দর হয়ে কার্ট রোডের পাশে যেমন ফুটে রয়েছে স্নিগ্ধা নামে এই সুন্দর বাংলো বাড়ি, তেমনি স্নিগ্ধার কোলে ফুটে রয়েছে হেমা। জেঠামণির বড় আদরের ভাইঝি হেমা। সুশিক্ষার গুণে যেমন এ-বাড়ির ভদ্রতা সৌজন্য আর শালীনতা, তেমনি হেমার মনের গভীরের সব ভাবনার লজ্জাও শান্ত হয়ে শুধু ফুটে থাকে। কথা মনে আসলেই কথা বলে ফেলা এখানে রীতি নয়। রাগ আর অভিমানও কখনো চিৎকার হয়ে বেজে ওঠে না। আগ্রহ আছে, আবেগ আছে, উদ্বেগ আছে স্নিগ্ধার জীবনে, কিন্তু যেন এক সুন্দর হিমের প্রলেপ দিয়ে সব-কিছুরই উত্তাপ শান্ত ক'রে দিয়েছে এক সুশিক্ষা।

শুধু শান্ত নয়, সুন্দরও। বিয়ের উৎসবের সন্ধ্যাদীপ জ্বলে উঠবার অনেক আগেই নিজেকে সুন্দর ক'রে সাজিয়ে তুলতে ভোলেনি হেমা।

সব সময় নিজেকে সুন্দর করে রাখাই এ বাড়ির নিয়ম, এ-বাড়ির শিক্ষা। বড় সুন্দর এই শিক্ষার বন্ধন, মাত্রা আছে কিন্তু গ্রন্থি নেই। আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রতি সন্ধ্যার আগে যেমন দু'ঘণ্টা ধ'রে প্রসাধনের সাধনা করে হেমা, আজও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কম নয়, বেশিও নয়। আজ চার বছর ধ'রে জীবনের প্রতি সন্ধ্যার আগে ঠিক যেমন ক'রে তার সুগৌর দু'টি বাহুতে যতখানি গোলাপী পাউডার ছিটিয়েছে হেমা, আজও ঠিক ততখানিই ছিটিয়েছে। ব্যস্ত হওয়া, বিচলিত হওয়া আর মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়া এ-বাড়ির নিয়ম নয়, হেমার মনের জগতেরও নিয়ম নয়।

দার্জিলিং-এ কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের এইরকমই একটি অতি শান্ত ও সুন্দর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হ'লো ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোডের ধারের ভবধাম নামে এক বাড়ির ছেলে নীহারের, যে নীহার আজ চার বছর ধ'রে শুধু বিচলিত উদ্বিগ্ন আর ব্যস্ত হয়েছে। একেবারেই ব্যস্ত হ'তে পারে না, আর এগিয়ে যেতে পারে না যে মেয়ে, তারই কাছে এগিয়ে আসবার জন্য আজ চার বছর ধ'রে ব্যস্ততারই সাধনা ক'রে এসেছে নীহার। শিল্পী নীহার টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে আজ চার বছর ধ'রে শুধু হেমার ছবি এঁকে এসেছে।

শোনা যায়, বাঞ্ছিতার প্রেম লাভের জন্য আজকাল আর কেউ সত্যই তপস্যা করে না; কিন্তু নীহার যা করেছে, সেটা তপস্যার চেয়ে কম কোন ব্যাপার নয়। বছরের মধ্যে যে ছয়মাস দার্জিলিং-এ এসে থেকেছে নীহার, সেই ছয়মাসের একটি দিনও কার্ট রোডের ধারে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের অভিভাবক রিটায়ার্ড পি-এম-জি মিস্টার বসুরায়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে যেতে ভোলেনি। কিসের জন্য আর কার জন্য নীহারের এই আসা-যাওয়ার, ব্যস্ততার আর আগ্রহের সাধনা, সেটা অনুমান করতে দেরিও হয়নি কারও। জেঠামণি আর জেঠিমা যতখানি বুঝেছিলেন, তার চেয়ে বেশি বুঝেছিল আর সবচেয়ে আগে বুঝেছিল স্বয়ং হেমা।

স্নিগ্ধা নামে এই বাড়ির বারান্দা আর সামনে অর্কিডের রঙীন বাহার, নীহারের জীবনের সকল আগ্রহের এক তীর্থনিকেতনেরই মত হয়ে উঠেছিল। জেঠামণির আর জেঠিমার দুই চেয়ারের মাঝখানে আর এক চেয়ারে হাসি-ভরা মুখ আর শান্ত দু'টি চোখ নিয়ে বসে থাকতো হেমা। হেমারই মুখ-শোভার কাছে এসে প্রতিদিন যেন নীরবে অভ্যর্থনা জানিয়ে যেত নীহার।

বিস্মিত হ'য়েছে হেমা, ভালও লেগেছে হেমার। যেন ঠিক এইরকমই চেয়েছিল হেমা। স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের জেঠামণি আর জেঠিমাও এই-রকমই চেয়েছিলেন। ভালবাসার রীতি ঠিক এইরকমই শান্ত হওয়া উচিত। মেলা-মেশার নিয়মে এইরকমই সুরুচি থাকা ভাল। নীহারকে খুবই পছন্দ হয়েছিল জেঠামণির ও জেঠিমার।

খুবই স্বাভাবিক, নীহারকে ভাল লাগবে হেমার। হেমা তার জীবনের সব শোভা নিয়ে সুন্দর ও শান্ত হ'য়ে ফুটে থাকে, আর নীহার তার দু' চোখের পিপাসা নিয়ে ছুটে আসে প্রতিদিন। হেমার মনের গভীর একটা শান্ত ও সুন্দর অহংকারই যেন ঝক ক'রে হেসে ওঠে। একদিন নয়, দু'দিন নয়, চার বছর ধ'রে যে-মানুষটি হেমাকেই জীবনের স্বপ্ন ক'রে রেখেছে, তার ভালবাসার নিষ্ঠা দেখে আশ্চর্য হতে হয় বৈকি। অথচ, হেমা একদিনের জন্য একটা সুন্দর কথাও নীহারকে বলেনি।

সুন্দর একটা কথা কেন, নীহারের লেখা একশতের উপরও চিঠির কোন একটারও উত্তর দেয়নি হেমা। জানে হেমা উত্তর না দিলেও কিছু আসে যায় না। উত্তর দেবার দরকারও পড়ে না। উত্তর দিতে ইচ্ছাও করেনি বোধহয়। ইচ্ছা করলেও ওভাবে হাতটাকে বেহায়া ক'রে দিতে ভাল লাগে না হেমার।

টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের চেয়েও বেশি সুন্দর মনে হয়েছে যে-মেয়ের মুখের ছবিকে, নীহারের চিঠির লেখাতে সেই ছবিই দেবী হয়ে উঠলো একদিন। —মনে হয় তুমি দেবতার মেয়ে এক দেবিকার মতই! কথাগুলি পড়তে আরও ভাল লাগে হেমার। নীহারের প্রেমের ভাষা পুজারীর মুখের ভাষার মত হ'য়ে উঠেছে। মুগ্ধ হয় হেমার মনের কল্পনা। এমন ক'রে ভালবাসতে পারে যে মানুষ, সে-মানুষ সত্যই ভালবাসার মানুষ। তাই একদিন হঠাৎ ব্যারাকপুরের এক খুড়িমার চিঠি পড়ে আশ্চর্য হয়নি হেমা। বিন্দুমাত্রও কোন আপত্তি মনের মধ্যে দেখা দেয়নি।

জেঠিমা তো হেমাকে কোনমতে হাঁটিয়ে নিয়ে এলেন কিন্তু আবার একটা সমস্যা দেখা দিল।

বিয়ের রেজিস্ট্রার মিস্টার তালুকদারের সামনে, ঘরভরা মেয়ে আর পুরুষের হাসিভরা মুখ আর খুশিভরা চোখের সম্মুখে, ফর্মের উপর সই করবার সময় কলম ধরবার জন্য হাত তুলতে পারলো না হেমা। শেষে স্বয়ং জেঠিমাই এগিয়ে এসে হেমার হাতে কলম ধরিয়ে দিলেন, আর জেঠিমাই হেমার সেই কলমধরা হাত ধরে কোনরকমে ফর্মের উপর বুলিয়ে বুলিয়ে হেমার নামটা লিখিয়ে নিলেন।

এ আবার কিরকম কাণ্ড? হেমার মনের কোন প্রতিবাদের ইঙ্গিত? অনিচ্ছার আভাস?

মোটেই নয়। রেজিস্ট্রার হাসলেন, ঘরভরা মানুষ হেসে ফেললো। সকলে না হোক, অনেকেই জানতেন. এইরকম একটা কাণ্ড ক'রে বসবে হেমা। বড় বেশি শান্ত, বড় বেশি অচঞ্চল আর বড় বেশি লাজুক হেমা।

আবার অনেকেই জানে, বিশেষ ক'রে কার্ট রোডেরই সুমিতা, চিত্রা আর আইভি জানে, মোটেই লাজুক নয় হেমা। কিন্তু একটু কেমন-যেন হেমা। ওরা বোধহয় জানে না যে, সুন্দর ক'রে সাজিয়ে রাখা অহমিকাই হলো এটিকেট, ভাষা হাসি আর চোখের জল একটু অস্পষ্ট ক'রে রাখাই সব চেয়ে বড় স্টাইল। ওরা বিশ্বাসও করতে পারে না যে, যে-হেমা প্রাণ দিয়ে এটিকেট আর স্টাইলকে ভালবেসেছে, তার কাছে স্টাইল আর এটিকেটও প্রাণ হয়ে গিয়েছে।

হেমার হাত দুটো যেন নিজেরই শোভার ভারে সর্বক্ষণ ভারি হয়ে রয়েছে, পৃথিবীর কারও অনুরোধের কাছে সাড়া দেয় না ওর হাত। বার্চ হিলের পার্কে বেড়াতে গিয়ে ভুলেও কোনদিন একটা ফুল তুলতে পারেনি হেমা। আরও আশ্চর্য, সুমিতা ফুল তুলে নিয়ে হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে, তবু সে ফুল হাতে তুলে নিতে পারেনি হেমা। কারণ, হাতের পোজ ভাঙ্গতে পারে না হেমা। নীল রঙের উলের জামপার দু' ভাঁজ করে বুকের উপর জড়িয়ে ধরে রেখেছে হেমার দুটি সুন্দর হাতের যে সুন্দর ভঙ্গী, অনেক ভেবে-চিন্তে আর চেষ্টা করে গড়া ভঙ্গী, সেই ভঙ্গীটিকে বার্চ হিল পার্কের শোভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ এলোমেলো ক'রে দিতে মন চায় না হেমার, পারেও না হেমা। ভুল বুঝবে সুমিতা, ভুল বুঝবে আইভি, বুঝুক, কিন্তু ওদের একটা খামকা অনুরোধের জন্য নিজেকে ভেঙ্গে দিতে পারে না হেমা।

এরকম কাণ্ডও যে করতে পারে সে তার বিয়ের দিনে ঐরকম একটা কাণ্ড যে করবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? একঘর লোকের চোখের সম্মুখে এতদিনের শান্ত পোজ ভঙ্গী আর নিয়মের যত্ন দিয়ে তৈরী হাতটাকে হঠাৎ বেহায়া ক'রে দিতে পারবে কেন হেমা?

মিস্টার তালুকদারের সম্মুখে আর ঘরভরা লোকের চোখের সামনে ব'সে ফর্মের উপর জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছার স্বীকৃতি নিজের হাতে এঁকে দেবার জন্য নিজের চেষ্টায় কলম হাতে তুলে নেওয়া হেমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সাহায্য করলেন জেঠিমা। জীবনের এতদিনের একটা শান্ত

ও সুন্দর পোজ ভেঙ্গে দিতে পারে না হেমা। এইমাত্র ব্যাপার; এর চেয়ে বেশি কোন রহস্য এর মধ্যে নেই।

নানা সুরুচি সুশিক্ষা আর নিয়মে লালিত স্নিগ্ধা নামে এই বাংলো বাড়ির জীবনে এই সন্ধ্যাটাই আবার হঠাৎ একটা সমস্যা সৃষ্টি ক'রে বসলো, বিয়ের উৎসব শেষ হ'লো যখন, আর কালিম্পং-এর ছোট দাদুর বাড়ীর রমা হেনা আর লিলিও চলে গেল। ওরা থাকলে বোধহয় সমস্যাটা এত কঠিন হয়ে উঠতে পারতো না।

অভ্যাগতেরা সবাই বিদায় নিয়েছেন, সব কলরব শান্ত হয়ে গিয়েছে, রাতও হয়েছে, হিমেল কুয়াশা এসে ঘরে ঢুকেছে, আর নীহার ব'সে আছে একটি ঘরের নিভৃতে একা একা একটি সোফার উপর, সম্মুখে টেবিলের উপর এক জোড়া ফুলদানির দিকে তাকিয়ে। সমস্যা, সত্যই সমস্যা, এখন এই ঘরের ভিতরেই আসতে হবে হেমাকে।

যে জেঠিমা হেমাকে বিয়ের আসর-ঘরের ভিতরে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিও দূরে স'রে রইলেন। বাসর-ঘরের দিকে হেমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে আসতে পারে না স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের কোন গুরুজনের আগ্রহ। কারণ, এই কাজটা বড় বেশি বাস্তব ও স্পষ্ট একটা কাজ।

আর হেমা? হেমার পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব। বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলেই হঠাৎ পা দুটোকে এত বেহায়া ক'রে তুলতে পারবে না হেমা। তা'হলে যে হেমার এতদিনের যত্নে গড়া জীবনের সুন্দর ভঙ্গীই ভেঙ্গে যায়।

চুপ ক'রে বসে থাকে হেমা। জেঠিমা'র দুধে গরদ শাড়ির ফুলকাটা আঁচল আর এখানে-ওখানে কোথাও দেখা যায় না। ঘরের ভিতরে গিয়ে বোধ হয় শ্রান্ত হয়ে হাঁপাচ্ছেন জেঠিমা। অনেক ব্যস্ত হয়েছেন, অনেক খেটেছেন, অনেক কথা বলেছেন, আজকের উৎসবকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আর না, এর চেয়ে বেশি আর কোন অসম্ভ্রমের কাছে এগিয়ে যেতে পারে না এই স্নিগ্ধার সুরুচিশীল আত্মা।

—এখনো ওখানে বসে আছিস কেন হেমি?

ধমকের মত এবং চিৎকারের মতই মাত্রাছাড়া আর ছন্নছাড়া এক সম্ভাষণের ধ্বনি হঠাৎ চমকে উঠলো শান্ত ও শ্রান্ত স্নিগ্ধার ঘরের বাতাসে। উৎসবশ্রান্ত স্নিগ্ধার এই রাতটার সমস্যাটাকে এতক্ষণ ধরে আর এক ঘরের জানালা

দিয়ে লক্ষ্য করছিল আর সহ্য করছিল যাঁর দু' চোখের দৃষ্টি, তাঁরই গলার স্বর জেগে উঠেছে। কথা বলেছেন কালিম্পং-এর দাদু, জেঠিমারই ছোট কাকা, লেফটেন্যান্ট কর্নেল দত্ত চৌধুরী, আই-এম-এস, তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে যিনি মাঝে মাঝে স্নিগ্ধার শান্ত নিয়মের জীবনের মধ্যে অনিয়মের উৎপাত সৃষ্টি ক'রে চলে যান।

কালিম্পং-এর দাদু যে বাড়ি করেছেন, সে বাড়ির কোন নাম নেই। কিন্তু নাম দিলে নাম দেওয়া উচিত রূঢ়া, কারণ স্নিগ্ধার জীবন যে নিয়মে চলে, ঠিক তার বিপরীত নিয়মে চলে কালিম্পং-এর দাদুর বাড়ির জীবন। জেঠামণি ও জেঠিমা যেমন কালিম্পং-এর বাড়িকে দু'দিনের বেশি সহ্য করতে পারেন না, ছোট দাদু আর ছোট দিদাও তেমনি কার্ট রোডের পাশে বাতাসার মত পাতলা মারবেলের টুকরো দিয়ে গড়া স্নিগ্ধাকে দু'দিনের বেশি সহ্য করতে পারেন না।

কালিম্পং-এর দাদুর বাড়ির খাবার টেবিলে যেন ভূমিকম্পের মত ব্যাপার চলে, ঝন ঝন ঠুং ঠং ডিস-চামচ-কাঁটার শব্দের আছাড়ি-পিছাড়ি। ছোট দাদু'র মেয়েরা মেয়ে হয়েও যে-ভাবে শব্দ ক'রে আর বাইরের লোকের সামনেও মুর্গির হাড় চিবোয়, দেখে আতঙ্কিত হয় আর শিউরে ওঠে হেমার চোখ। পিয়ানোর বুকের উপরে কফির পেয়ালা রাখতে ছোট দাদুর হাতে একটুও বাধে না। যেমন তিব্বতী কুকুরের চিৎকারে তেমনি ছোট দাদু, ছোট দিদা, আর রমা, সোমা ও লিলির উচ্চহাসির শব্দে কালিম্পং-এর বাড়ির বাতাস মত্ত হয়ে থাকে। শুনে কতবার চমকে উঠেছে হেমা, যা মনে আসে তাই বলে ফেলতে একটুও বাধে না সোমার মুখে। আর, রমার সাজসজ্জার রীতিটা তো একটা রীতিই নয়। একটা জর্জেটকে যেন কোন মতে এলোমেলো ক'রে গায়ে জড়িয়ে রাখে রমা; একবার বেড়িয়ে এলেই দেখা যায়, নতুন শাড়ির তিন জায়গায় ছিঁড়ে কিংবা ফেঁসে গিয়েছে। লিলি যে-সব গান ছোট দাদু আর ছোট দিদার সামনেই গলা খুলে গাইতে থাকে, শুনে কান ফিরিয়ে নিয়েছে হেমা, চলে গিয়েছে অন্য ঘরে। দু'দিনের জন্য বেড়াতে গিয়ে কালিম্পং-এর বাড়ির অনিয়মকে সহ্য করতে পারেনি হেমাও।

কালিম্পং-এর বাড়ির অনিয়মের মানুষগুলিও এসেছিল সবাই, চলে গিয়েছেও সবাই, শুধু যাননি ছোট দাদু, কারণ তিনি আগামী কাল সকালে এক মানুষখেকো লেপার্ডের সন্ধানে নেমে যাবেন শিলিগুড়ির দিকে।

তিব্বতী কুকুর আর রাইফেল নিয়ে ছোটদাছ্ যে ঘরের ভিতরে এখনো ঘুমিয়ে পড়েননি, বুঝতে পারে নি হেমা।

ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে, ভারি ভারি ছুটি শক্ত চামড়ার চটির কর্কশ শব্দ তুলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এলেন ছোটদাছ্ লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল দত্ত চৌধুরী আই-এম-এস।

আবার কথা বললেন ছোটদাছ্, এবং এমনি চাপাস্বরে বললেন যে, সারা কার্ট রোডই যেন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলো। চমকে উঠলো হেমা, একেবারে একটা উল্টো কথা বলে ধমক দিচ্ছেন ছোটদাছ্—কি রে, তুই এখনো এরকম বেহায়ার মত চুপ ক'রে বসে করছিস কি?

শুনে চুপ করে থাকে হেমা। ছোট দাছুর কাছে এইরকমই কথা আশা করা যায়। স্নিগ্ধার জীবন যে নিয়মে আর যে রুচিতে ও শিক্ষায় সুন্দর হয়ে উঠেছে, ঠিক তার উল্টো নিয়মের মানুষ এইরকম কথাই তো বলবেন। ফোটা ফুল তার সকল রঙের মায়া মুছে ফেলে হঠাৎ বিশ্রী হয়ে যেতে পারছে না, কিন্তু ছোট দাছুর মতে তাই হলো বেহায়ার মত বসে থাকা। ছোটদাছ্ জানেন না, কল্পনাও করতে পারবেন না, স্নিগ্ধার মেয়ে হেমার এটিকেট-লালিত প্রাণ যে সুন্দর শান্ত একটি গর্বে প্রসন্ন হয়ে আছে, এবং সে গর্ব হঠাৎ ভেঙ্গে ফেলতে গেলে সে মেয়ের প্রাণটাই যে অসুন্দর হয়ে যায়। চার বছর ধরে যে মানুষ হেমাকেই উপাসনা করেছে আর হেমার কাছেই এসেছে, আজ হঠাৎ হেমা তার কাছে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে যাবে কেন? তাহ'লে হেমার জীবনের সেই মায়ার আবরণই যে হঠাৎ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, যে মায়ার আবরণের দিকে চার বছর ধ'রে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে এসেছে এক শিল্পী মানুষ, আর টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের ছবি আঁকাও ছেড়ে দিয়েছে।

লজ্জা নয়, ঐ ঘরের নিভৃতে বসে যে মানুষ তার মন-প্রাণের সব চাঞ্চল্য নীরব ও ধীর প্রতীক্ষায় সহ্য করছে, তার কাছে যেতেই চায় হেমা। কিন্তু বাইয়ে দিতে হবে। হেমার অন্তরের এই সহজ ও সুন্দর একটা অহংকারকে কেউ বুঝতে পারছে না, ভাবতে গিয়ে সংসারের উপর না হোক নিজের অদৃষ্টের উপর একটা অভিমান জাগে হেমার মনে, এবং হেমার ছোট ছোট মৃছ্ নিঃশ্বাসের মধ্যে বেদনাও ছড়ায়।

ছোটদাছুর মুখের দিকে তাকায় হেমা। আশ্চর্য হয় হেমা, কি অদ্ভুত স্নেহকোমল দৃষ্টি ফুটে রয়েছে ঐ প্রকাণ্ড শরীর ছোটদাছুর ছুই চোখে।

ছোট দাদু বলেন—ভয় কিসের? লজ্জা কেন যে?

ছোটদাদুর চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠেছে, দেখতে পায় হেমা। প্রার্থনা করার সময় জেঠামণির দু'চোখেও জল দেখা দেয়। সে দৃশ্য প্রায় প্রতিদিনই দেখেছে হেমা। চমৎকার দেখায় জেঠামণির সেই জলভরা চোখ। কিন্তু কি সুন্দর কালিম্পং-এর ছোটদাদুর চোখে এই একটুখানি যে জলের আভাস চিকচিক করছে!

হেমার কাঁধে হাত রেখে ডাক দেন ছোটদাদু—আয়, চল আমার সঙ্গে।

উঠে দাঁড়ায় হেমা। স্নিগ্ধার নিয়মের স্নেহে আর শিক্ষায় সুন্দর একটি জীবনের রঙীন ভঙ্গী শান্ত ও আশ্বস্ত হয়ে ছোটদাদুর পাশে পাশে চলতে থাকে।

—হেমা এসেছে নীহার। ছোটদাদুর আস্তে বলা সেই কথা আর কণ্ঠস্বর শুনতে পায় সারা কার্ট রোডের স্তব্ধতা। ঘরের ভিতরে এক সোফার উপর হেমাকে বসিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন তাঁর ভারি চটি আর ফ্ল্যানেলের প্যাণ্টালুন নিয়ে প্রকাণ্ড শরীর ছোটদাদু। নিজের হাতেই ঘরের দরজার কপাট বন্ধ করে দিয়ে চলে গেলেন।

রূপকথার দেশেরই মত, কুয়াশায় ঢাকা এক অবাস্তব রাজ্যের মধ্যে শুধু একটি আলোভরা নিভৃত জেগে রয়েছে, কার্ট রোডের পাশে এক ভবনের নিভৃত। নীহার ও হেমা, চার বছর ধরে যারা দুজন শুধু দুজনের কাছে পরম আপন হয়ে যাবার জন্য একটি দিনের প্রতীক্ষায় ছিল, তাদেরই প্রতীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেখানে আসবার ছিল, আসা উচিত ছিল, সেখানেই আজ তারা এসে গিয়েছে। জীবনে এই প্রথম, হেমার সুন্দর মুখের শোভাকে চোখের অতি নিকটে দেখতে পেয়েছে নীহার। জীবনে এই প্রথম নীহারের সেই ভাসা-ভাসা বড় বড় স্বপ্নভরা সুন্দর আর সর্বদা মুগ্ধ চোখ দুটিকে চোখের বড় কাছে দেখতে পেয়েছে হেমা। টেবিলের উপর ঐ জোড়া ফুলদানির মতই ওদের জীবন আজ বড় কাছাকাছি আর পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে গিয়েছে। একটি জীবনের সুন্দর ক'রে সেজে থাকা আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা এক ভঙ্গী এবং একটি জীবনের চার বছর ধ'রে ব্যস্ত হয়ে থাকা আর আশায় ও স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা এক আগ্রহ। সংসার স্বীকার ক'রে নিয়েছে; আজ ওরাই দুজন হলো এই বাসরনিভৃতের বর আর বধূ।

সোফার উপর বসে আছে হেমা, সেই পরিপাটি মায়ামূর্তি। একটি ভুরুতে সেই ছোট একটি ঢেউ সামান্য উদ্ধত হয়ে রয়েছে। দুই ঠোঁটে সেই মৃদু হাসির একটি রেখা সেইভাবেই সুন্দর একটি ছন্দ ধরে রেখেছে। একটা হাত ঠিক সেই রকমই অলসভাবে কোলের উপর লতিয়ে দিয়েছে হেমা। হেমার ভঙ্গীমনোহর যে মূর্তি চার বছর ধরে মুগ্ধ করেছে নীহারকে, সেই মূর্তিই আজ নীহারের জীবনের কাছে সমর্পিত উপহারের মত বসে আছে।

এত সুস্থির আর এত পরিপাটি ক'রে সাজানো যার জীবনের ভঙ্গী, মনের ভাষাকেও মুখের এক অমুখর হাস্যভঙ্গীর ছায়ায় অস্পষ্ট ক'রে রাখা যার রীতি, এক শীলশাস্ত্র নিয়মের স্নেহে লালিত হয়ে এসেছে যার প্রাণ, সেই হেমাই চমকে ওঠে তার মনের দিকে তাকিয়ে। যেন অস্থির একটা নিঃশ্বাস অলজ্জ পিপাসার মত দুরন্ত হয়ে তার শান্ত হৃৎপিণ্ডটাকে অশান্ত ক'রে দিতে চাইছে। চার বছর ধরে ভাল লেগেছিল যে মানুষকে, সে-মানুষকে এমন ক'রে ভাল লাগবে, কল্পনাও করতে পারেনি হেমা, এমন ভাবনা বরণ করার জন্য প্রস্তুতও ছিল না হেমা। মনে হয়, এই আলোকিত নিভৃত এই মুহূর্তে এক বিপুল অনুরোধ হয়ে বেজে উঠবে। লজ্জা? হ্যাঁ, এই লজ্জাকে ভয় করে হেমা, কিন্তু সহ্য করতে চায় না। জীবনের এত-দিনের যত্নে গড়া সুন্দর ভঙ্গীর অন্তরালে অন্য একটা প্রাণ জেগে উঠে ছটফট করছে। এই নতুন হেমাকে দেখতে পাচ্ছে না কি নীহার, এমন ক'রে অপলক চোখ নিয়ে যে নীহার কাছে বসে তাকিয়ে আছে হেমারই মুখের দিকে?

হ্যাঁ, অপলক চোখ তুলে নীহার হেমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু দেখছিল বোধ হয় তার নিজের মনেরই ভিতর এক শীতল উদাস ও থমকে-থাকা ছায়ার দিকে। কল্পনাও করতে পারেনি নীহার, তার চার বছরের অস্থির মন আজ হঠাৎ এই নিভৃতের স্পর্শ পেয়ে এমন শান্ত হয়ে যাবে। নীহারেরই প্রেমের আহ্বানকে আজকের উৎসবের মধ্যে সবার চোখের সামনে স্বীকার ক'রে নিয়েছে যে নারী, যার মুখ প্রথম দেখবার পর টাইগার হিলের সূর্যোদয়ের শোভা আর কোন দিন দেখতে যায়নি নীহার, সেই নারীই তার সেই পরিপাটি মায়ামূর্তি নিয়ে এত কাছে বসে রয়েছে এই নিভৃতের একটি অনুরোধ শুনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে; কিন্তু যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছে নীহারেরই অন্তরাত্মা।

শুধু অনুভব করে নীহার, তার কাছে বসে আছে দেবতার মেয়ের মত এক দেবিকা। ধীর স্থির ও শান্ত এক মহিমা। পূজারীর মত সুন্দর কথার

মন্ত্র দিয়ে যে মূর্তিকে চার বছর ধরে আরাধনা করে এসেছে নীহার, সেই মূর্তিকে তারই জীবনের এই নিভৃতের সঙ্গিনী বলে মনে করতে গিয়ে মনটাই যেন হঠাৎ ভীরু হয়ে গিয়েছে। নীহারের অপলক চোখ এক অসহায়তার বেদনায় যেন ধীরে ধীরে পাথরের চোখের মত সব চাঞ্চল্য হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকে। তার নিঃশ্বাসের সব উত্তাপ যেন এক সমাধির গভীরে অন্তর্হিত হয়েছে। একটা হিমাক্ত বিদ্রূপ গ্রাস করে ফেলেছে নীহারের ধমনীর সব শোণিতকণিকার আবেগ। হেমা, সেই হেমা যেন এক সাদা পাথরের অন্তরের অহংকার, সুন্দর এক ভঙ্গীর মধ্যে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মানুষের বাসরঘরের প্রয়োজন ঐ দেহ স্পর্শ করতে সাহস করে না, শক্তিও পায় না।

নীহার ও হেমা, চার বছরের নিরন্তর এক মনের টানের উৎসব আজ সকল উদ্বেগ আর আকুলতার সমাপ্তির পর একটি পরিণামের কাছে এসে পৌঁছেচে। আশ্চর্যই বলতে হবে, কার্ট রোডের পাশে স্নিগ্ধা নামে এই ভবনের একটি কক্ষের সুন্দর ক'রে সাজানো সেই নিভৃতও কি যেন আর কেমন-যেন একটা সমস্যার বেদনা সহ্য করতে গিয়ে উদাস হয়ে গেল।

কথা বলে নীহার। অনেক কথা। আজ চার বছর ধরে প্রতি চিঠির প্রতি ছত্রে যে-সব কথা লিখেছে নীহার, সেই সব কথা। পৃথিবীর যে-কোন শোভার চেয়ে বেশি সুন্দর বলে মনে হয়েছে তোমাকেই, দেবতার মেয়ে এক দেবিকার মত মনে হয়েছে তোমাকে; ভোর বেলার আলোকের শিশিরের চেয়েও উজ্জ্বল। চৈত্রের পলাশের চেয়েও রঙীন, আর বর্ষার ঝরনার চেয়েও পরিপূর্ণা বলে মনে হয়েছে তোমাকে।

কোন কথা না বলে শুধু শুনতে থাকে হেমা। সত্যই যেন একটা নিখুঁত সাদা পাথরের কানের কাছে বৃথাই বেজে চলেছে নীহারের আরাধনার ভাষা। ধীর স্থির ও শান্ত হেমার সুন্দর ও পরিপাটি ভঙ্গীটাই যেন পাথরের মত কঠিন হয়ে রয়েছে, একটুও উতলা হয় না, বিস্মিত হয় না, বিচলিত হয় না।

যেন কতগুলি প্রলাপ বকে নিজেকে কোনরকমে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছে নীহার, কিন্তু বুঝতে পারে, তার বুকের ভিতরে একটা শূন্যতার মধ্যে নীরব এক হাহাকার ছুটোছুটি করছে। কোথায় ভুল হলো, কেন এমন হলো, বুঝতে পারে না নীহার। কি ভয়ংকর এক ব্যবধানের অভিশাপ লুকিয়েছিল এই নিভৃতেরই সান্নিধ্যের মধ্যে। কত দূরে সরে রয়েছে হেমা! কি নিষ্ঠুর এক কুণ্ঠায় নিথর হয়ে গিয়েছে নীহারের বুকের ভিতরের সব আকুলতার স্পন্দন।

চুপ করে নীহার। অনেকক্ষণ। তারপর বলে—কিছু মনে করোনা হেমা, আর আজ কোন নতুন কথা তোমার কাছে বলতে পারলাম না হেমা।

হেমা বলে—কেন ?

উত্তর দিতে পারে না নীহার।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকায় হেমা। হ্যাঁ, কুয়াশায় ঢাকা রাত্রি অনেকক্ষণ হলো ভোর হয়ে গিয়েছে। সোফা থেকে উঠে ঘরের দরজা পার হয়ে চলে যায় হেমা।

আর এক ঘর থেকে বের হয়ে এসে বারান্দার উপর দাঁড়ালেন ভোরের প্রার্থনার খাতা নিয়ে জেঠামণি, আর সামনের লনের উপর এক ফুলের-টবের আড়াল থেকে ফুল হাতে নিয়ে জেঠিমা।

বারান্দা পার হয়ে অন্য ঘরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ার আগে একবার থমকে দাঁড়াতে হলো হেমাকে। ডাক দিয়েছেন কালিম্পং-এর ছোট দাদু।—এদিকে একবার আয় দেখি হেমি।

থমকে দাঁড়িয়েই থাকে হেমা। তারপর অবসন্নভাবে কাছের এক চেয়ারে শান্ত হয়ে বসে পড়ে। অগত্যা ছোট দাদু তাঁর তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে আর শক্ত চামড়ার চটির কর্কশ শব্দ বাজিয়ে হেমার কাছে এগিয়ে এলেন। —অ্যাঁ, এত গম্ভীর মুখ কেন রে ? এ তো ভাল কথা নয়।

একটি ভুরুর উপর ছোট একটা ঢেউ সামান্য একটু উদ্ধত হয়ে ওঠে, দুই ঠোঁটের উপর মৃদুহাসির রেখায় সেই ছন্দ শিউরে ওঠে, অলসভাবে একটি হাত কোলের উপর লতিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আর অতি শান্তস্বরে হেমা বলে —কে বললে গম্ভীর হয়েছি ?

ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোডের ধারে ভবধাম নামে পদ্মকাটা ইঁটের তৈরী এক ভবনের এক কক্ষের নিভৃতে খোলা জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে ভিতরে ছড়িয়ে পড়লো একদিন। নীহার তার জীবনের চার বছর ধরে আরাধনা করা আর স্বপ্নে-দেখা সেই মুখের দিকে তেমনি অপলক চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। কে জানে, হয়তো এই আশা ছিল নীহারের মনে, ব্যারাকপুরের আকাশের চাঁদের আলো আর নারকেলের ছায়ার স্পর্শ পেয়ে নীহার ফিরে পাবে তার জীবনের সেই নিঃশ্বাসের উত্তাপ, দার্জিলিং-এর কার্ট-রোডের একটি রাত্রির হিমাক্ত কুয়াশার বিদ্রূপে যে নিঃশ্বাস শীতল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই আশাই আবার নিজের লজ্জায় থর থর কেঁপে উঠলো নীহারের বুকের ভিতর। চাঁদেরই আলো ছড়িয়ে পড়েছে হেমার মুখে, কিন্তু

অতি শান্ত ধীর ও স্থির, এবং নিখুঁত সুন্দর ও পরিপাটি এক ভঙ্গীর উপর পড়ে সেই চাঁদের আলোও যেন হিম হয়ে গিয়েছে। অনেক সুশিক্ষা দিয়ে তৈরী অচঞ্চল এক ভঙ্গিমা। সুন্দর হয়ে সেজে থাকা আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা একটা প্রাণ। ব্যাকুল হতে পারে না, অস্থির হতে পারে না, ব্যস্ত হতে জানে না, মুহূর্তের ভুলেও নিজেকে একটুও এলোমেলো ও ছন্দছাড়া করতে পারে না হেমার এই শান্তমূর্তি।

আজও অনুভব করতে পারে না, উপলব্ধিও করতে পারে না, শুধু বিস্মিত হয় নীহার, কেন এমন হলো? দেবীর মতই বটে ঐ মেয়ে। চার বছরের আরাধনায় কার্টরোডের এক ভবনের যে মেয়েকে নীহার নিজেই দেবী ক'রে দিয়েছে, তার কাছে নিজেকে আজ একটি ক্ষুদ্র ছায়া বলে মনে হয় কেন? তবে কি কোন ভুল হয়েছে? চার বছর ধরে কি শুধু আত্মহত্যার সাধনা করে এসেছে নীহার? মানুষকে মানুষের চেয়ে বেশি মনে ক'রে ভালবাসলে ভুল করা হবে, এ আবার কোন্ শাস্তির নিয়ম?

হেমা জানে না, বিশ্বাসও করে না, সে কোন ভুল করেছে তার মনে আর আচরণে। বিয়ের আগের চারটি বছরের কত মুহূর্তে কতবার মনে হয়েছে হেমার, মানুষটি সত্যই দেবতারই মত ভালবাসতে জানে। আর আজও ব্যারাকপুরের ট্রাঙ্ক রোডের পাশে জ্যোৎস্নামাখা এক নিভৃতের মধ্যে নিঃশব্দে বসে থাকে, আর হাজার হাজার দুঃসহ মুহূর্ত সহ্য করতে গিয়ে আরও বেশি ক'রে ও মর্মে মর্মে বিশ্বাস করে হেমা, ঠিকই, দেবতারই মতো এই মানুষটির ভালবাসার রীতি।

কিন্তু হঠাৎ চমকে ওঠে হেমা। ঘরের ভিতর ছটফট ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীহার। দেবতা যেন তার দেবত্বকে সহ্য করতে পারছে না। যেন জীবনের এক দুঃসহ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে বিদ্রোহ করতে চাইছে নীহার। তুফান খুঁজছে দেবদারুর অন্তরের বাসনা। সত্যই, যেন এক মত্ত ঝড়ের নেশা গায়ে মাখবার জন্য ঘরের ভিতর অস্থির হয়ে পায়চারি ক'রে বেড়ায় নীহার, মাঝে মাঝে খোলা জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়। চুপ ক'রে দেখতে থাকে হেমা, দেখতে ভাল লাগে হেমার। আকাশচারী দেবতার মন বোধহয় হঠাৎ মাটির সৌরভের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠতে চাইছে।

চমকে উঠেছিল হেমা, তার পরেই দুর্বোধ্য এক বিস্ময়ের মধ্যে যেন সমাহিত হয়ে যায় হেমার জীবনের সব কৌতূহল। ঝড়ের মত নয়, যেন এক শ্রান্ত ও ক্লান্ত পাখির ভাঙা ডানার ঝাপটানির মত কতগুলি ক্ষীণ

ও কাতর নিঃশ্বাস হেমাকে জড়িয়ে ধরেছে। হেমার মাথাটাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত যেন খেলা করছে অদ্ভুত একটা আকুলতা, পাগল যেমন ফুল নিয়ে খেলা করে। ভিজে গিয়েছে আবার জলেও গিয়েছে হেমার দুই ঠোঁটের হাসি-শিউরানো রেখা। অনেক আশা নিয়ে সহ্য করে হেমা, কিন্তু কয়েকটি মুহূর্তের মোহ মাত্র, মিথ্যা ও বৃথা। তারপরেই যেন স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় দীর্ণ হয়ে যায় হেমার সব কৌতূহলের আত্মা। এই মানুষটির মত্ততার নিঃশ্বাস যেন এক ঘাসবনের ঝড়ের নিঃশ্বাস, বৃথা ও অকারণ এক উদ্দামতার অভিনয় মাত্র।

আস্তে আস্তে এক হাতের শুধু মৃদু একটি ঠেলা দিয়ে নীহারের হাত সরিয়ে দেয় হেমা। নীহার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু তাকিয়ে থাকে। কী নিষ্ঠুর আর কী কঠোর হেমার এই সুন্দর হাতের মৃদু একটি আপত্তির নির্দেশ! যেন নীহারের প্রাণের সব স্নায়ুতন্তু ও শোণিত চিরকালের মত চূর্ণ ক'রে দিচ্ছে ভয়ানক এক বিদ্রূপের বজ্র।

স্থির ও শান্ত রঙীন হয়ে ফুটে থাকা হেমা তেমনি ধীর ও অবিকার ভঙ্গীমনোহর মূর্তি নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে। নীহার বলে—আমার একটি অনুরোধ আছে হেমা।

হেমা—বল।

নীহার—আমাকে ভুল বুঝবে না।

হেমা—কে বললে ভুল বুঝেছি?

যেন সুন্দর এক ক্ষমার ভাষা, দেবতার মেয়ের মতই এক দেবিকার করুণার ভাষা। বিকার নেই, বেদনা নেই, অভিমান নেই, রাগ নেই—সুস্থির ও অচঞ্চল এই রঙীন ভঙ্গীর করুণাও কী ভয়ানক হিমশীতল। হেমার দু'চোখের নিশ্চল তারা দুটোর দিকে চোখ পড়তেই যেন স্তব্ধ হয়ে যায় নীহারের সব প্রশ্ন আর অনুরোধের প্রাণ। এইভাবেই কি চিরকাল শুধু ক্ষমা করবে আর করুণা করবে হেমা, আর নীহারের জীবন চিরকালের এক অপমানের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে থাকবে?

হেমাই কথা বলে আবার। —আমি কালই দার্জিলিং চলে যাব।

আর্তনাদ চাপতে চেষ্টা করতে গিয়ে নীহারের গলার স্বর কেঁপে ওঠে—কেন হেমা?

হেমা—আশ্চর্য হচ্ছো কেন?

নীহার—যেতে চাইছো যাও, কিন্তু আবার…।

হেমা—আবার আসবো বৈকি।

মিথ্যা বলেনি হেমা। স্নিগ্ধার মেয়ে হেমা কার্ট রোডের কুয়াশার কাছ থেকে আবার ব্যারাকপুরের নারকেলের ছায়ার কাছে এসেছে। আবার ফিরে গিয়েছে।

কালিম্পং-এর ছোট দাদুই একদিন চিৎকার করলেন—কি রে হেমি, তোর হাবভাব যেন ভাল মনে হচ্ছে না। এত গম্ভীর কেন?

হেসে হেসে উত্তর দিতে চেষ্টা করলো হেমা, কিন্তু পারলো না। কালিম্পং-এর দাদুর দুই চোখের দৃষ্টি আর প্রশ্নের সম্মুখে হেমার জীবনের হাসি-ভরা ভঙ্গী এই প্রথম ভেঙ্গে গেল।

ছোটদাদু চেঁচিয়ে বলতে থাকেন, আর রমা সোমা ও লিলি হেসে গড়িয়ে পড়তে থাকে।—দিব্যি তাজা চেহারার মানুষ তুই, শরীরে কোন বাজে ফ্যাট নেই, তব কেন এতদিনের মধ্যেও···কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না কেনরে?

ঘরভরা হাসির ঝড়ের মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে হেমা, আর বুঝতে পারে, ছোট-দাদুর কথাগুলি তার চোখে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে, সে জ্বালা সহ্য করাও যায় না।

আবার চিৎকার ক'রে উপদেশ দেন ছোটদাদু—ডোণ্ট প্রিভেণ্ট।

—মিথ্যে কথা! চেঁচিয়ে ওঠে হেমা। যেন চেঁচিয়ে উঠেছে হেমার অন্তরাত্মা। সুন্দর হয়ে সেজে থাকা আর রঙীন হয়ে ফুটে থাকা মেয়ের চিরকেলে সুন্দর ভঙ্গীর কঠিন সংযমকে এই প্রথম একটি আঘাতে শিউরে দিয়ে যেন এক রুদ্ধ অপমানের বেদনা চেঁচিয়ে উঠেছে। এভাবে জীবনে এই প্রথম কথা বললো হেমা।

ঘরভরা হাসির সোর হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়! ছোটদাদুও হেমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হন।

ধীরে ধীরে প্রখর একটা জিজ্ঞাসা যেন জেগে উঠতে থাকে প্রকাণ্ড-শরীর ছোটদাদুর সন্দেহ বিচলিত দুই চোখে। ছোটদাদু বলেন—আমি নীহারকেই একবার জিজ্ঞাসা করতে চাই। বলিস তো ব্যারাকপুরে গিয়েই জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

—না। যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে আর বিচলিত হয়ে একটা কান্না-চাপা স্বরে আপত্তি জানায় হেমা!

কালিম্পং-এর ছোটদাদুর বাড়িতে আর একটা দিনও থাকতে পারলো

না হেমা। ছোটদাহু অনেক অনুরোধ করলেন—আর কটা দিন থেকে যা হেমি, গ্যাংটক রোডের দিকে একদিন বেড়িয়ে আয়, কমলালেবুর বনের হাওয়া খেয়ে আর রডোডেনড্রনের রং দেখে খুশি হবি।

কালিম্পং-এর বাড়িতে নয়, দার্জিলিং-এর কার্টরোডের বাড়িতেও নয়; কোথাও আর ছুটো দিনও সহ্য করতে না পেরে ব্যারাকপুরের নারকেলের ছায়ার বাড়িতেই চলে এল হেমা। আর, দিনের পর দিন, জ্যোৎস্নার ও অন্ধকারের অনেক রাত্রির পর রাত্রি, পদ্মকাটা ইঁটের ভবধামের এক নিভৃতে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে হেমা, হিমের দেশের কমলালেবুর বনের হাওয়া আর রডোডেনড্রনের রং-এর কাছ থেকে পথ ভুলে সে আজ এই নারকেলের ছায়ার দেশে এক গ্রেসিয়ারের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

আর নীহার। দেবতার মেয়ের মত দেবিকার ঐ মূর্তিকে নয়, নিজেরই এই মূর্তিটার উপর ঘৃণা সহ্য করতে গিয়ে যেন আরও পাথর হয়ে গিয়েছে নীহার। নিভৃতে, চোখের সামনে, বুকের এত কাছে হেমা, তবু নীহার শুধু অলস উদাস ও ব্যথা-কুণ্ঠিত এক অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে হেমাকে দেখছে, অতি দূরের আকাশের এক তারকার দিকে যেভাবে মানুষ তাকিয়ে থাকে।

আশ্চর্য হয়, আর বিরক্তও হয় হেমা, তবু কেন বার বার সেই একই কথা আজও ধ্বনিত হয় তার কাণের কাছে—ভুল বুঝবে না হেমা।

কিন্তু বুঝবার আর কি বাকি আছে যে ভুল বুঝতে হবে? বেশ তো, একটি স্পষ্ট ও চরম প্রশ্নের কাছে স্পষ্ট উত্তর দিয়ে এই ভুল বুঝাবুঝির পালা চুকিয়ে দিলেই তো হয়।

মনের ভুলে নয়; ইচ্ছা করেই চিঠি লিখে ফেললো হেমা—আপনি একবার আসবেন ছোটদাহু। কল্পনা করতে পারে হেমা, ব্যারাকপুরের এই চিঠি পড়ে কালিম্পং-এর প্রকাণ্ড-শরীর ছোটদাহুর হাস্যচঞ্চল চোখ ছুটো কেমন বিষণ্ণ, আর কত বিচলিত হয়ে উঠেছে।

সত্য-মিথ্যার হিসাব-নিকাশ করার জন্তই প্রস্তুত হয়েছে হেমা। যেন এক স্বপ্নের-ঘোরে হঠাৎ তুঃসাহসী হয়ে একটা সুস্পষ্ট প্রশ্ন আহ্বান ক'রে ফেলেছে হেমা। চিঠি পেয়ে গিয়েছেন ছোটদাহু, ব্যারাকপুরের ভবধামের আত্মাকে এক কঠোর প্রশ্নের আঘাত থেকে রক্ষা করবার আর উপায় নেই।

ছোটদাহু কবে আসবেন, কোন ঠিক নেই, কোন উত্তর দেন নি। কিন্তু আসবেন নিশ্চয়। হেমা যে মীমাংসা চেয়েছে, সেই মীমাংসাই পেয়ে

যাবে হেমা। কয়েকটা দিন শুধু ধৈর্য ধরে পার ক'রে দেওয়া। তবে আবার এত ছটফট করে কেন হেমা?

ব্যারাকপুরের বাড়ির আনাচে-কানাচে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখছে হেমা। যেন নিজেরই এক হঠাৎ নিষ্ঠুরতার চেহারা দেখে ভয়ে চমকে উঠেছে হেমার বুক। চার বার লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা সেরে নিয়ে খুড়িমা যখন খোঁজ করেন, আর বার বার ডাকাডাকি করেন, তখন শুধু হেমা একবার সামনে এসে দাঁড়ায়। খুড়িমা প্রশ্ন করেন—জ্বর-টর হয় নি তো বউমা?

—না। খুড়িমাকে আশ্বস্ত করে পরমুহূর্তে তেমনি ছটফট ক'রে পালিয়ে যায় হেমা। বোধহয় বুঝতেও পারে না হেমা, এরকম ছটফট করতে গিয়ে তার এতদিনের জীবনের সুন্দর ও শান্ত ভঙ্গীটাই যে বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বেশিদিন নয়; একা ঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বৈকালী বাতাসে চঞ্চল নারকেলের ছায়ার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখতে পায় হেমা, তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে ভবধামের গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকছেন কালিম্পং-এর ছোটদাদু? দু'হাতে দু'চোখ ঢাকা দেয় হেমা, নিজেরই বুকের ভিতর থেকে যেন একটা ধিক্কার ছুটে বের হতে চায়, এ কি কাণ্ড করে বসে আছে হেমা! জীবনের এক নিভৃতে লুকিয়েছিল যে অপমান, সেই অপমানকে পৃথিবীর চোখের সামনে টেনে এনে কি লাভ হলো হেমার?

ব্যস্তভাবে ঘরে ঢোকে নীহার। সুসংবাদ জানিয়ে দিতে এসেছে নীহার—ছোটদাদু এসেছেন।

হেমা—তাতে তোমার কি?

একথা বলতে চায়নি হেমা, কিন্তু বলে ফেলার পর হেমা নিজেই আশ্চর্য হয়ে নিজের উপরে রাগ করে। একথা বলেই বা কি লাভ হলো হেমার? কা'কে সাবধান ক'রে দিতে চাইছে হেমা?

বিস্মিত হয় নীহারও। মনে হয়, সত্যই বিচলিত হয়েছে হেমা। এত-দিনের নির্বিকার শান্ত ও সুন্দর হাসিভরা ভঙ্গীকে হঠাৎ বিরক্ত ক'রে দিয়েছে কোন বেদনা কিংবা কোন অভিযোগ।

নীহার বলে—আমারই ভুল হয়েছে, এখানে একবার আসবার জন্য ছোট দাদুকে একটা চিঠি দেব বলে মনে ক'রেও ভুলে গিয়েছি। যাই হোক, নিজের থেকেই যখন এসে গিয়েছেন......।

হেমা—তাতে কি হয়েছে?

নীহার—তুমি ওঁকে বুঝিয়ে বলো, যেন কিছু মনে না করেন।

হেমা—আমি বলবো, তুমি কিছু বলতে যেও না।

চলে যাচ্ছিল নীহার। হেমা ডাকে—আর একটা কথা।

নীহার—বল।

হেমা—তুমি ছোট-দাছুর সঙ্গে কোন কথাই বলতে যেও না।

নীহার—তার মানে?

হেমা—তুমি ছোটদাছুর কাছেই যেও না।

নীহার—সে কি!

নীহারের বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে দপ ক'রে জ্বলে ওঠে হেমার চোখ। এক অর্থহীন জীবনের এক অর্থহীন বিস্ময় হেমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এখনও। জানে না, কল্পনা করতে পারে না, ধারণা করবারও শক্তি নেই এই মানুষটির, যে ভয়ংকর মানুষী জিজ্ঞাসার আঘাত থেকে বাঁচবার পথ বলে দিচ্ছে হেমা, দেবতার মত এই মানুষটিকে।

কিন্তু হেমার দপ ক'রে জ্বলে ওঠা চোখই উদাস হয়ে যায়। অদ্ভুত এক বেদনায় মন্থর হয়ে ভাসতে থাকে চোখের দুটি তারা। কিন্তু কিসের জন্য, আর কার জন্য এই বেদনা? মনে হয় হেমার, নীহারের সামনে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলে জলে ভেসে যাবে তার চোখ। —যাই প্রণাম করে আসি ছোট-দাছুকে। বলতে বলতেই চলে যায় হেমা।

আর নীহার তার এই নতুন বিস্ময়েরই আস্বাদে যেন মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই হেমা যে একেবারে অন্য রকমের হেমা। যেন ঘরোয়া প্রাণেরই মত ঘরের এক দুঃখের উপর রাগ ক'রে বিচলিত হ'য়ে উদাস হয়ে আর মুখ ভার ক'রে ছুটে চলে গেল হেমা। হেমা তার ঘরেরই আপনজনের জীবনকে কি যেন এক আঘাতের ছোঁয়া থেকে বাঁচাতে চায়, তাই তার এত উদ্বেগ। চলে গিয়েছে হেমা, কিন্তু যাবার আগে যেন তার জীবনের ঐ বড় বেশি শান্ত ও কঠিন ভঙ্গী হঠাৎ মুহূর্তের মত ছিন্ন ক'রে নীহারের চোখের উপরেই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছে, আত্মা আছে হেমার, আর সেই আত্মা নীহারের জীবনের যে কোন দুঃখে দুঃখী হতে পারে, দেবতার মেয়ে দেবিকার মত শুধু করুণা করে না।

চঞ্চল হয়ে ওঠে নীহারের নিঃশ্বাস, উষ্ণ ও উন্মুখ এক স্পৃহার প্রাণ সব পিপাসা নিয়ে যেন জেগে উঠেছে সেই নিঃশ্বাসে। ভুল হয়েছে। অমন ক'রে হেমাকে চলে যেতে না দিলেই ভাল ছিল। বুকে জড়িয়ে ধরা

উচিত ছিল হেমাকে। এই হেমাকে কত সহজে বুকে জড়িয়ে ধরা যায়। জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল হেমাকে, তুমি উদ্বিগ্ন হলে কেন? কেন এসেছেন ছোট-দাদু?

কেন এসেছেন ছোট-দাদু? প্রশ্নটা মনে আসতেই হঠাৎ এক সংশয়ে চমকে ওঠে নীহারের মন। যেন এক ভয়ংকর হেঁয়ালির বুকের ভিতরটা এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে নীহার।

বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভবধামের একটি কক্ষে ছোট-দাদুর চোখের সম্মুখে বসে থাকে হেমা। তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে প্রকাণ্ড-শরীর ছোট-দাদু তাঁর দুই চোখে প্রখর এক জিজ্ঞাসা আর প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু হেমা যেন সারাক্ষণ সতর্ক হয়ে বসে আছে। কালিম্পং-এর দাদুকে চোখের সামনেই আটক ক'রে রাখতে চাইছে হেমা, যেন ঐ জিজ্ঞাসা এই ভবধামের এক অসহায় দেবত্বকে আক্রমণ আর অপমান করবার কোন সুযোগ না পায়।

চা খেয়ে বেড়াতে বের হয়ে গেলেন ছোট-দাদু; হাঁপ ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় হেমা। যেন ছোট-দাদুকে সরিয়ে দেবার জন্যই হেমার হাসিভরা চোখের ভঙ্গী এতক্ষণ ধরে একটা অভিসন্ধির মত এখানে বসেছিল।

এতক্ষণে একটু নিশ্চিন্ত হয়েছে হেমা। কিন্তু জীবনে এই প্রথম যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে হেমা। জীবনে কোনদিন এভাবে এমন দুরূহ দুঃসহ ও অদ্ভুত একটা চেষ্টা করতে হবে, ভবধান নামে এক বাড়ির একটা মানুষকে অপমান থেকে বাঁচাবার জন্য, কোনদিন কল্পনাও করেনি হেমা।

কিন্তু তারপর?

তারপর, ছবিঘরের মত রঙীন ক'রে সাজানো এক ঘরের নিভৃতে চুপ ক'রে এক দেবত্বের শীতল নিঃশ্বাসের কাছে বসে থাকতে হবে। এই তো হেমার জীবনের পরিণাম।

হঠাৎ ঘরে ঢুকলো নীহার। হেমা একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, যেন একটা ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠে চলে এসেছে নীহার। কিন্তু নীহারের হাতে টাটকা ফুলের গুচ্ছ। নীহারের মুখটাও যেন রঙীন হয়ে উঠেছে। দুই চোখ দীপ্ত ও চঞ্চল। কে জানে, আজ কি দেখতে পেয়ে আর কিসের আশ্বাসে প্রসন্ন হয়ে উঠেছে নীহারের বুকের বাতাস।

নারকেলের পাতার ঝালর ঝির ঝির করে, সেই সঙ্গে ঝির ঝির করে ঘরের ভিতরে ঝরে পড়ে সন্ধ্যার চাঁদের আলোক। নীহার ডাকে—হেমা।

ধীর স্থির ও শান্ত, সেই সুন্দর হয়ে ফুটে থাকা এক জীবনের ভঙ্গী। হেমা চুপ ক'রে বসে এই আহ্বানের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে।

পূজারীর নিষ্ঠার মত এক আগ্রহ ডাকছে সুন্দর সুশিক্ষা ও নিয়মের স্নেহে লালিত এক ভঙ্গীকে। এই নিভৃত যেন এক মন্দিরের নিভৃত। ধুলো নেই, আবর্জনা নেই। শব্দ এখানে নিরুদ্দাম, ভাষা এখানে মন্ত্রের মত, নিঃশ্বাস এখানে ধূপসুরভির মত।

রিক্ত উদাস ও শূন্য এক নীরবতার মধ্যেই একে একে ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে মুহূর্তগুলি। সুন্দর ও পরিপাটি এক পবিত্রতার অভিশাপে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে দুই পাথরের ফুল, নীহার ও হেমা।

নারকেলের পাতার ঝালর ঝির ঝির করে। নীহার ধীরে ধীরে হেমার আরও কাছে এগিয়ে আসে।—এখনি চলে যেও না হেমা!

চলে যায় না হেমা! আর, নীহার যেন তার প্রাণের শেষ সামর্থ্য উৎসর্গ ক'রে তার অন্তরের গভীর হতে এক সমাহিত নিঃশ্বাসকে উদ্ধার করার জন্য অপলক চোখে হেমার শান্ত পরিপাটি ও মৃদু হাসি নিয়ে ফুটে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু বৃথা।

ছলছল করে নীহারের কণ্ঠস্বর।—আর কিছুক্ষণ থাক হেমা।

থাকে হেমা, নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে ঝির ঝির ক'রে ঝরে পড়া জ্যোৎস্নার ছোঁয়া বরণ ক'রে নিয়ে বসে থাকে হেমা। মনের গভীরে শেষ আশার যে বিহ্বলতাটুকু এখনও ধুকপুক করছে, সেই আশা ও সেই বিহ্বলতাকে এখনি বিদায় ক'রে দিতে চায় না হেমা।

কিন্তু বৃথা। আরও কিছুক্ষণের পর অনেকক্ষণ পার হয়ে যায়; দেখতে পায় হেমা, শুধু বিষণ্ণ ও বেদনাপন্ন এক অদ্ভুত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে নীহার। কি ভয়ানক হতাশ ও অসহায় দৃষ্টি। যেন হেমার জীবনে এত যত্নে গড়া সুন্দর ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে আছে এক অভিশাপ।

আগুনের জ্বালার চেয়েও জ্বালাময় এক ঘৃণার জ্বালা জ্বলে ওঠে হেমার বুকের পাঁজরগুলিতে। ছিন্নভিন্ন হয়, চূর্ণ হয়, পুড়ে যায় হেমার সুন্দর হয়ে সেজে থাকা জীবনের ভঙ্গী আর দুই ভুরু ও দুই অধরের পোজ, যে ভঙ্গী ও পোজের শোভাকে দেবতার মেয়ে দেবিকার মুখের শোভা ব'লে বুঝেছিলো চার বছর ধরে তাকিয়ে থাকা এক মানুষের দুটি চক্ষু।

—ছিঃ। শুধু একটি কথায় জ্বালা রেখে দিয়ে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় হেমা।

কিন্তু হেমার উতলা ছন্দছাড়া আর এলোমেলো মূর্তিটাই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়, দরজার কপাটে শাড়ির আঁচলে আটকে গিয়েছে। হয়তো আর পিছনে না তাকিয়ে কপাটের বাধা থেকে এক টানে আঁচল ছাড়িয়ে আর ছেঁড়া আঁচল নিয়েই চলে যেত হেমা, কিন্তু যেতে পারলো না, কারণ অতি করুণ এক আর্তনাদের মত একটা শব্দ শুনে চমকে উঠেছে হেমা।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে; পিছন ফিরে তাকায়, তার পরেই উতলা বিস্ময়ের মত ফিরে এসে ঘরের ভিতর ঢোকে।

নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে ঝির ঝির ক'রে ঝরেপড়া জ্যোৎস্না নীহারের বড় বড় সুন্দর চোখের জলের উপর চিকচিক করছে।

—একি? চমকে ওঠে হেমার গলার স্বর। দেখতে পায় হেমা, ভেজা চোখ নিয়ে একেবারে শান্ত ও সুস্থির হয়ে বসে আছে নীহার। মনে হয়, যেন এক শিশুর চোখ, সংসারের সব সান্ত্বনা যেন ওকে ঠকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

হেমার শাড়ির আঁচলটা গা থেকে খসে মেজের উপর লুটিয়ে পড়েছে। খোঁপার ছাঁদ ভেঙ্গে গিয়ে চুলের স্তবক এলিয়ে পড়েছে। নেকলেসের লকেটটাও যেন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আটকে গিয়েছে ব্লাউজের কাঁধের সঙ্গে। যেন এক বন্য বাতাসের ঝড়ে এলোমেলো হয়ে গিয়েছে হেমার ছন্দে-বাঁধা জীবনের সাজ।

হ্যাঁ, অসহায় ও একলা এক শিশুর মতই যে মনে হয় ঐ মানুষটিকে। নীহারের মুখের দিকে তাকিয়ে হেমার দু'চোখেও যেন এক বন্য স্নেহ উতলা হয়ে উঠতে চায়। শিশুর কান্নার মত সেই অসহায় কান্নার তৃষ্ণাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কি এক লোভ যেন ঝড় হয়ে জেগে উঠছে হেমার বুকের গভীরে।

ছুটে এসে নীহারের কাছে দাঁড়ায় হেমা। বদলে গিয়েছে হেমার মূর্তিটাই। যেন বাইরের জগতের যত সভ্য ও ভব্য আর সুরুচিকঠিন ভঙ্গীর শাসন চূর্ণ করা, সব সাজানো লজ্জার নিয়ম ছিন্ন করা, মাত্রাছাড়া একটা মত্ততা ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে নীহারের কাছে। হেমার হাত দু'টো যেন হেমার এই আলুথালু মূর্তিটার সব সাজের আর লাজের শাসন ছিঁড়ে ফেলবার জন্য ছটফটিয়ে ওঠে। বিহ্বল বুকের সব উত্তাপ আর কোমলতা মুক্ত করে দিয়ে বিপুল এক সান্ত্বনার উৎসব নীহারের চোখ আর মুখের উপর লুটিয়ে দিতে থাকে হেমা।

ঝির ঝির ক'রে জ্যোৎস্না ঝরে নারকেলের পাতার ঝালরের ফাঁকে ফাঁকে।

আর একবার চমকে উঠলো হেমার উতলা মনের বিস্ময়। এ কি? দুরন্ত আগ্রহের দুই বাহু আর উত্তাপে বিহ্বল এক নিঃশ্বাসের টানে হঠাৎ বিব্রত হয়েও পরক্ষণেই বুঝতে পারে, আর বুঝতে পেরে ধন্য হয়ে যায় হেমার মন, স্বামীর বুকেই বন্দী হয়ে গিয়েছে হেমার জীবন। এই নিভৃতের সব ভুলের অভিশাপই চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

ঘরের দরজা খোলা। দরজার পর্দা বাতাসে ফুর ফুর ক'রে উড়ছে। নারকেলের পাতার ঝালর থেকে চাঁদের আলো সরে গিয়েছে। রাত হয়েছে।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যায় হেমার। ঘরের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তেই লজ্জা পেয়ে শিউরে ওঠে। ব্যস্তভাবে কোনমতে তাড়াতাড়ি চেহারাটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো হেমা। যা ভয় করেছিল হেমা, তাই হয়েছে।

তিব্বতী কুকুর কোলে নিয়ে বারান্দার উপর এক চেয়ারে বসে আছেন ছোটদাদু।

—হেমি, কাছে আয় দেখি। ডাক দিলেন ছোট-দাদু।

ছোট-দাদুর কাছে এসে দাঁড়ায় হেমা। বড় বড় চোখ আরও বড় ক'রে আর হাসতে হাসতে ছোট-দাদু মুখ তুলে হেমার মুখের দিকে তাকাতেই হেমা ছোট-দাদুর মুখ চেপে ধরে।—পায়ে পড়ি তোমার, চিৎকার ক'রে কোন কথা বলো না ছোট দাদু।

অতসী আজ একা। সিনেমা হাউসের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে অতসী, কেউ আজ আর তার সঙ্গে নেই।

এটা একটা নতুন দৃশ্য বটে। এই সিনেমা হাউসের গেটের কাছে অতসীকে কোন দিন একাকী এসে দাঁড়াতে দেখা যায় নি। একাকী চলে যেতেও দেখা যায় নি। কেউ না কেউ তার সঙ্গী হয়ে আসে, এবং কারও না কারও সঙ্গিনী হয়ে অতসী চলে যায়।

এখানে স্টেসন আর বাজার; তারই মধ্যে একটি সিনেমা হাউস। অনেক আলো জ্বলে এখানে, এবং মানুষের মুখের অনেক কলরব রাত দু'টো পর্যন্ত এই জায়গাটার মুখরতা জাগিয়ে রাখে। কিন্তু এর পরেই যে মাইল খানিক লম্বা পথটা, সেটা সন্ধ্যা হতেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে। পথের দু'পাশে শুধু খোলা মাঠের বুকে বাতাস হু-হু করে, আর শিরশির করে কাশের বন।

পথটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেখানে অবশ্য সন্ধ্যা হতেই বিজলী বাতির চমক জাগে। নতুন একটা কাগজের মিল। হরেক রকমের বাংলো আর একই রকমের সারি সারি কোয়ার্টার। যেমন অফিসারদের বাংলো বাড়ির ফটকে, তেমনি কেরানি, কর্মী আর মজুরদের কোয়ার্টারের আঙিনায় আলোর মেলা জেগে থাকে। সন্ধ্যা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত। অতসীর চোখের সামনে এখনকার মত সমস্যা শুধু এই যে, অন্ধকারে ভরা ঐ পথটা একা একা পার হয়ে যেতে সাহস হয় না। অতসীর মত বয়সের কোন মেয়েরই পক্ষে এরকম সাহস করা উচিতও নয়। এই বয়সটাও যে সঙ্গিহীন হয়ে থাকার বয়স নয়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অতসী। মিলের স্টোরবাবু প্রতুল বিশ্বাসের মেয়ে অতসী বিশ্বাস। শীতের সন্ধ্যা শেষ হয়েছে, রাতটা কুয়াশার ঘোরে ঘন হয়েও উঠেছে। সিনেমা হাউসের গেটের কাছে যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে অতসী। চারদিকের কলরবও একটু মৃদু হয়ে এসেছে। অতসীর মত আরও যারা সিনেমা হাউসের ছবি দেখতে এসেছিল, তারাও চলে গিয়েছে। অতসী শুধু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে যেন তার এই একাকিত্বের দীর্ঘশ্বাস শুনছে। সত্যিই অতসীর রঙীন

ব্লেজারের ওভারকোটের পিঠটা তার দোলানো বেণীর ঘষা খেয়ে যেন একটা আর্ত নিঃশ্বাসের শব্দের মত আক্ষেপ করে। অতসীর কালো মুখটা যেন ভয় পেয়ে আরো কালো হয়ে গিয়েছে। পথের অন্ধকারের ভয় তো আছেই, কিন্তু বোধহয় সেজন্য নয়। অতসী যেন তার এই একলা জীবনের রূপটাকেই দেখতে পেয়েছে। এই রূপের সঙ্গী হবার জন্য কাছে ছুটে আসবে, এমন মানুষ বোধ হয় এই সংসারেই নেই।

কিন্তু এতদিন তো ছিল অনেক সঙ্গী। হেসে হেসে গল্পের ফোয়ারা ছুটিয়ে কোন না কোন সঙ্গীর সঙ্গিনী হয়ে এই সিনেমা হাউসে কতবার ছবি দেখতে এসেছে আর চলে গিয়েছে অতসী। মিলের বাবু কলোনির কে না জানে সেই কাহিনী? সকলেই জানে, প্রতুল বিশ্বাসের ঐ কুৎসিত চেহারার মেয়েটা নিজেই যেচে যেচে এক একটা সঙ্গী ধরে। কিন্তু তারপর আর কতদিন? ওর ঐ ভয়ংকর কালো মুখ সেই সঙ্গীকে দশটা দিনও কাছে ধরে রাখতে পারে না। বিরক্ত হয়ে, ভয় পেয়ে আর সন্দেহ ক'রে সরে যায় ক'দিনের সঙ্গী।

কেউ তো আর বাকি নেই। কিছুদিন দেখা গেল, লেবরেটরির শচীনকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমার ছবি দেখতে চলেছে অতসী। তারপর কিছুদিন ইলেকট্রিশিয়ান বীরেন। তারপর আর একজন। শেষ পর্যন্ত ছিল একজন। অতি নিরীহ, মুখচোরা আর নিতান্তই ছেলেমানুষ প্রিয়নাথ, মিলের এক্যাউণ্ট্যাণ্ট প্রিয়নাথ। অনেকেরই ভয় হয়েছিল, ঘায়েল হলো বুঝি প্রিয়নাথ। প্রায় একটানা তিন মাস ধরে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটা দিন অতসী বিশ্বাসের সঙ্গী হয়ে সিনেমার ছবি দেখতে গিয়েছে প্রিয়নাথ। অতসীর বাবা প্রতুল বিশ্বাসও এখানে-ওখানে অসাবধানে হঠাৎ বলেও ফেলেছেন—ভাবছি, প্রিয়নাথের সঙ্গে অতসীর বিয়ে হলে কেমন হয়? মন্দ নয় ছেলেটি।

কিন্তু মুখচোরা প্রিয়নাথের মনের ভয় এক দিন সতর্ক হয়ে উঠলো। আর কোন দিন অতসীর সঙ্গে প্রিয়নাথকে কোথাও দেখা যায়নি। মুখচোরা প্রিয়নাথ এক দিন মুখ খুলে ব'লে না দিয়ে পারেনি—আমার সময় নেই মিস বিশ্বাস! সিনেমার ছবি দেখার রুচিও আমার নেই।

অতসীর মত বয়সের মেয়েকে বিয়ে করার মত বয়সের ছেলে এই ছোট একটা কলোনির সংসারে ক'জনই বা আছে? লেবরেটরির শচীন, ইলেক্‌-ট্রিশিয়ান বীরেন, একাউণ্ট্যাণ্ট প্রিয়নাথ, এবং আরও যাদের কথা মনে পড়ে প্রতুলবাবুর, এক এক ক'রে ঘটনার এক একটি পরীক্ষায় বেশ ভাল ক'রেই প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে যে, অতসীর কালো মুখটাই তাদের সবাইকে ভয়

পাইয়ে হুয়ে সরিয়ে দেয়। শুধু বেহায়া ব'লে দুর্নাম অর্জন করেছে অতসী। ক্লাবের আসরে প্রবীণ রতনবাবুও প্রৌঢ় জীবনবাবুর কলপ-লাগানো কালো চুলের দিকে তাকিয়ে বলেন—একটু সাবধানে থাকবেন জীবনবাবু। এই কলোনিতেই ছেলেধরার উপদ্রব দেখা দিয়েছে।

যারা অতসীর কালো মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কিছু সন্দেহ ক'রে আর ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল, তাদেরই বা দোষ কি? কেউ গায়ে পড়ে অতসী বিশ্বাসের সিনেমা-যাত্রার সঙ্গী হতে আসেনি। অতসী নিজেই বেণী দুলিয়ে বাবু কলোনির এ-পথে আর সে-পথে ঘুরেছে। যাকে দেখে মনে হয়েছে সঙ্গী হবার মত মানুষ, তারই মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়েছে আর কি যেন ভেবেছে। তার পর, প্রায় গায়ে পড়েই আর অদ্ভুত ঢং ক'রে অনুরোধ করেছে—আজ সন্ধ্যায় কষ্ট ক'রে আমার একটু উপকার করতে হবে। সিনেমা হাউসে একটু পৌঁছে দিয়ে আসবেন আর নিয়ে আসবেন। প্লীজ, একা যেতে আসতে বড ভয় করে, কি করবো বলুন?

সেই অতসী বিশ্বাসই আজ একা দাঁড়িয়ে আছে। কোন সঙ্গী নেই। চোখের সামনে শুধু পথের অন্ধকারের ভয়। সত্যিই অতসী বিশ্বাসের আজ বড় বেশি ভয় করছে।

হঠাৎ চমকে ওঠে অতসী। চোখের সামনে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। অতসীর কালো মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছে ভদ্রলোক।

ভদ্রলোকের মুখটা অতসীর অচেনা নয়। অনেক বার বাবু কলোনির এ-পথে সে-পথে, আর এই স্টেসন ও বাজারে এই ভদ্রলোককে অনেক বার আসতে যেতে দেখেছে অতসী। শুধু কি তাই? মনে পড়ে অতসীর, হ্যাঁ, এই ভদ্রলোকই তো, প্রতিদিন ঠিক বিকাল বেলায় অতসী বিশ্বাসের চোখের সম্মুখ দিয়েই চলে যান, প্রতিদিন বিকাল হ'লে, স্টোরবাবুর লতাজড়ানো কোয়ার্টারের বারান্দার উপর আরাম চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে বই পড়ে অতসী। সামনের পথের উপর দিয়ে ঠিক সেই সময়েই চলে যান ঐ ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের মুখের দিকে চোখ পড়তেই চোখ ফিরিয়ে নেয় অতসী। তার পর আবার বই পড়তে থাকে।

—আপনি কি এখন বাড়ি ফিরবেন?

ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনে একটু আশ্চর্যই হয় অতসী। অতসীর এই একাকী থমকে-থাকা অসহায় অবস্থাটা কি সত্যই আন্দাজ করতে পেরেছেন ভদ্রলোক? তাই সঙ্গী হতে চাইছেন?

উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অতসী, যে-মুখের দিকে এক বার মাত্র আনমনা ভাবে ভ্রূক্ষেপ ক'রে প্রায় প্রতিদিনই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অতসী। তাকিয়ে মুগ্ধ হবার মত কিছুই নেই এই ভদ্রলোকের মুখের চেহারায়। একটি নিরেট কালো মুখ, কিন্তু চোখের দৃষ্টিটা বড় স্বচ্ছ ও সরল। আর বয়স? ত্রিশ বছরের বেশি হবে না। অতসীর ম' বয়সের মেয়ের সঙ্গী হবার মত বয়স বৈকি।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে অতসী বলে—হ্যাঁ, বাড়ি ফিরবো তো, কিন্তু...।

—একা-একা অন্ধকারে অতটা পথ হেঁটে যেতে আপনি কোন অসুবিধা যদি বোধ করেন...।

অতসী হাসে—অসুবিধা বোধ করছি বৈকি। রীতিমত ভয় করছে।

—যদি বলেন, তবে আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি।

চমকে ওঠে অতসীর বিস্ময়। অতসীর এতক্ষণের এলোমেলো আর উদাস নিঃশ্বাসগুলির বেদনা যেন হঠাৎ এক সম্মান আর সান্ত্বনার ছোঁয়ায় প্রসন্ন হয়ে যায়। জীবনে এই প্রথম, একটি মানুষ নিজের থেকে যেচে অতসীর পথচলার সঙ্গী হতে চাইছে। ভদ্রলোক তেমনি অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে আছেন অতসীর মুখের দিকে। কে জানে, কি দেখতে পেয়েছেন ভদ্রলোক অতসীর ঐ কালো মুখের কুশ্রীতার মধ্যে।

প্রশ্ন করে অতসী—আপনি কি মিলের বাবু? কলোনিতে থাকেন?

ভদ্রলোক বলেন—কলোনির কাছেই থাকি।

অতসী—আপনি কি আমাকে চেনেন?

ভদ্রলোকের সরল চোখ দুটো অদ্ভুত ভাবে হেসে ওঠে।—চিনি বৈকি, আপনি তো আমাদের প্রতুল বাবুর মেয়ে?

অতসী—আমারও নামটা জানেন না কি?

লজ্জিত হন ভদ্রলোক—জানি।

অতসী—আপনি?

ভদ্রলোক—পরেশনাথ দত্ত।

অতসী—কিছু মনে করবেন না। কি করেন আপনি?

ভদ্রলোক—আমি হলাম...।

পরেশনাথ দত্তের মুখরতার উপর যেন প্রচণ্ড শব্দের আঘাত এসে লুটিয়ে পড়ে। পরেশনাথের কথা শেষ হবার আগেই দৈব আবির্ভাবের মত একটা ঝকঝকে মোটরকার হঠাৎ ব্রেক কষে থেমে যায় সিনেমা হাউসের

গেটের কাছে, আর কর্কশ হুংকারের মত হর্ণের আচমকা আওয়াজ শিউরে ওঠে।

—আপনি এখানে কি মনে ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন মিস বিশ্বাস?

মোটরকারের ভিতর থেকে মুখ বের ক'রে কথা বলে এক যুবক। সুন্দর সুশ্রী প্রসন্ন একটি মুখ। চিনতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না অতসীর। অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার মিস্টার চৌধুরীর ছেলে অভিলাষ চৌধুরী। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে পাটনাতে একটা সরকারী চাকরী পেয়েছে অভিলাষ। অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরছে সে। অতসী অনুমান করতে পারে, এই রাত দশটার ট্রেনেই এসেছে অভিলাষ। তাই তো এতক্ষণ ধরে অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজারের ঐ গাড়িটা স্টেশনের কাছে অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

বাবু কলোনির কোন কোয়ার্টারের মানুষ নয় অভিলাষ। বাবু কলোনির ছোঁয়া থেকে একটু দূরে আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অফিসারদের এক একটি বাংলো বাড়ি। সব চেয়ে বড় বাংলো না হোক, সবচেয়ে সুন্দর ক'রে সাজানো সেই বাংলোটাই হলো অ্যাসিস্টেণ্ট ম্যানেজার মিস্টার চৌধুরীর বাংলো। কতবার বড় দিনের সময় অভিলাষের বোন পারুল চৌধুরীর পিয়ানো শুনবার জন্য ঐ বাংলোতে গিয়েছে অতসী। দেখতে পেয়েছে অতসী, সেই বড়দিনের হাসিখুশির আর মেলামেশার উৎসবের সন্ধ্যাতেও বাইরের এক ঘরের ভিতরে বসে ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য বই পড়ছে অভিলাষ। সেই ঘরের দরজার কাছ দিয়ে যেতে যেতে কতবার থমকে দাঁড়িয়েছে অতসী। মুখ তুলে তাকিয়ে অতসীকে কতবার দেখেছে অভিলাষ। দেখা মাত্র শুধু একটি কথাই প্রতিদিন বলেছে—ভেতরে চলে যান মিস বিশ্বাস, পারুল আছে বোধহয়।

তারপরেই মুখ ঘুরিয়ে শুধু বই-এর দিকে তাকিয়েছে অভিলাষ। চুপ ক'রে ভিতরে ঢুকে পারুলের কাছে এসে বসেছে আর গল্প করেছে অতসী। তারপর চুপচাপ চলে গিয়েছে। বাবু কলোনির মেয়ে এক অফিসারের বাংলো-বাড়ির ছেলের দিকে তাকিয়ে এর চেয়ে বেশি দুঃসাহসী হতে আর পারেনি। যেচে, শতবার গায়ে পড়ে অনুরোধ করলেও অভিলাষ কখনো অতসীর সিনেমাযাত্রার পথে সঙ্গী হবে না, এই কাণ্ডজ্ঞান অতসীর ছিল ব'লেই হয়তো অতসী সেই অনুরোধের জাল এখানে ছাড়বার চেষ্টা করেনি কোন দিন। কিন্তু সাহস ক'রে যদি অভিলাষকেও সেই অনুরোধ করে ফেলতো অতসী?

হঠাৎ মনে হয় অতসীর, এতদিন অভিলাষকে সেই অনুরোধটা না করাই ভুল হয়েছে। অভিলাষের গাড়ির হর্ণের শব্দ, আর অভিলাষের হাসিভরা মুখ যেন অতসীর সেই ভীরু মনটাকে হঠাৎ আশার চমক দিয়ে এক মুহূর্তে উজ্জ্বল ক'রে দিয়েছে। অতসীর ফুলজড়ানো বেণী হঠাৎ দুলে ওঠে। দু' চোখের দৃষ্টিতে যেন উল্লাসের বিদ্যুৎ ঝলকায়। হেসে ছটফট ক'রে এগিয়ে যায় অতসী—আমাকে যদি আপনার গাড়িতে নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেন তবে প্লীজ…কাইণ্ডলি…।

অভিলাষ হাসে—আসুন।

হুংকারের মত হর্ণ বাজিয়ে ছুটে যায় অভিলাষ চৌধুরীর গাড়ি?

সেই মাত্র মাইল খানেক পথের অন্ধকারের ভিতর দিয়ে অভিলাষের পাশে বসে মোটরকারের তীব্র বেগের উল্লাসের মত মনের উল্লাস নিয়ে ছুটে আসতে আসতে অতসী কি কথা বলেছিল অভিলাষের কানের কাছে, কে জানে? কিন্তু এরই মধ্যে বাবু কলোনির অনেকেই জেনে ফেলেছে আর আশ্চর্য হয়েছে, মাত্র একটি রাতে সিনেমা দেখে বাড়ি ফেরার পথে এমন এক সঙ্গীকে ধরতে পেরেছে প্রতুল বিশ্বাসের মেয়ে, যে সঙ্গী অতসীর সারা জীবনেরই সঙ্গী হয়ে যাবে বোধহয়। কলোনির ক্লাবের আসরেও চমকে ওঠে অনেকের মনের বিস্ময়—কি আশ্চর্য!

এই ধারণার জন্য দায়ী হলেন স্বয়ং প্রতুল বাবু। তিনিই কথাপ্রসঙ্গে এখানে ওখানে অসাবধানে বলে ফেলেছেন—আশ্চর্য নয়, যদি অভিলাষের সঙ্গে অতসীর বিয়ে হয়ে যায়।

প্রতুল বিশ্বাসও তাঁর এই ধারণার জন্য দায়ী নন। অতসীর মুখ দেখে, অতসীর আবোল-তাবোল কথা থেকে এবং অনেক কিছু বুঝতে পেরে, শেষ পর্যন্ত অতসীর ঘরের টেবিলের দেরাজ থেকে একটি চিঠি নিয়ে পড়ে ফেলতেই বুঝে ফেললেন প্রতুল বাবু, অভিলাষ চৌধুরীর কাছেই অতসীকে সঁপে দেবার জন্য এইবার তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে।

পাটনা থেকে এসেছে অতসীর এই চিঠি, আরও চিঠি আগেই এসেছে মনে হয়, এবং এখনও আরও চিঠি বোধহয় আসতেই থাকবে।

অতসীও আজকাল ঘরের মধ্যেই সারাক্ষণ কাটায়, আর আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজেই নিজের ফুলজড়ানো বেণীর ছবি দেখে মুগ্ধ হয়। সারাদিনের জীবনের মধ্যে কাজের মত শুধু একটি কাজই খুঁজে পেয়েছে অতসী।

অভিলাষের কাছে চিঠি লেখে।—তোমার মত মানুষ আমার মত একটা কালোমুখের মেয়েকে ভালবেসেছে, এত বড় ভাগ্য যে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। তোমার দু'চোখ নিশ্চয়ই দেবতার চোখ, নইলে এই কুৎসিত মেয়ের মুখ দেখে মুগ্ধ হবে কেন?

সেই রাতে অভিলাষের সঙ্গিনী হয়ে, অভিলাষেরই পাশে বসে গাড়িতে চড়ে অন্ধকারের পথে ছুটে আসবার সময় সত্যিই অতসীর কানে কানে কোন কথা বলেনি অভিলাষ। অতসীও কোন কথা বলেনি। বলবার সুযোগই পায়নি অতসী। সারা পথ শুধু নতুন ব্রিজ তৈরীর একটা গল্প বলে গেল অভিলাষ, শোণ ব্রিজের চেয়েও অনেক বড় একটা ব্রিজ তৈরী হবে মোকামা ঘাটের কাছে।

অভিলাষের সঙ্গে আর দেখা করবারও সুযোগ পায়নি অতসী। পরের সকালেই পাটনা চলে গেল অভিলাষ, কিন্তু তাই বলে ভরসা ছাড়েনি, সাহসও হারায়নি অতসী। গায়ে পড়ে কথা বলার মতই নিজের মনের আবেগে বেহায়া হয়ে অভিলাষকে একটি চিঠি লিখে ফেললো অতসী।—একটি মেয়ের জীবনে একটি ভয়ের রাতে অন্ধকারের পথে যদি সঙ্গী হলেন, তবে তার কানের কাছে একটি ভাল কথাও কেন বলতে পারলেন না অভিলাষ বাবু? আমি যে অনেক আশা করেছিলাম।

অতসীর এই চিঠির উত্তর আসতে চারটে দিনও লাগেনি। তারপর থেকে চিঠি আসছেই। কী স্পষ্ট ভাষা! কোন আবরণ নেই, কোন কুণ্ঠা নেই। অভিলাষ চৌধুরী লিখেছে, চিরজীবন অতসীর ভালবাসা পেয়ে সে সুখী হতে চায়।

শুধু চিঠি লিখে লিখে আর তৃপ্ত হয় না মন। কবে আসবে অভিলাষ? বড়দিনের ছুটি হতে আর কত দিন বাকি? অতসীর হাত দুটো ছটফট করে। ফুলজড়ানো বেণী টেবিলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে মাথা পাতে অতসী। নিঝুম হয়ে পড়ে থাকে, যেন এক স্বপ্ন রাজ্যের মধ্যে হারিয়ে যায় অতসীর কল্পনা।

বড়দিন আসে, কিন্তু বড়ই শীতার্ত বড়দিন। মিলের বাবু কলোনির দক্ষিণে সেই শালবনের সব সবুজ এই শীতের বাতাসের ভয়ে চুপসে শুকিয়ে আর হলদে হয়ে ঝরে পড়তে থাকে।

বড়দিনের ছুটিতে বাড়ি এসেছে অভিলাষ। আজই সন্ধ্যাবেলা চা খাওয়ার

জন্য অভিলাষকে নিমন্ত্রণ করতে অভিলাষের কাছে গিয়েছিলেন প্রতুল বাবু। ফিরে এসেছেন প্রতুল বাবু।

প্রতুল বাবুকে কাছে পেয়েই মনের ঝাল মিটিয়ে অনেক শক্ত কথা বলে দিয়েছে অভিলাষ।—আপনার মেয়ের মাথা বোধহয় খারাপ হয়েছে। নইলে আমাকে ওসব কথা লিখলো কেমন ক'রে?

কোন দোষ নেই অভিলাষের। অতসীর প্রথম চিঠি পেয়েই স্পষ্ট ক'রে সেকথা জানিয়ে দিয়েছিল অভিলাষ, তারপর অভিলাষকে ভালবাসা জানিয়ে আবার চিঠি লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কি আশ্চর্য, অভিলাষের এই শক্ত চিঠির উত্তরে আরও মুগ্ধ এবং আরও কৃতজ্ঞ মনের ভালবাসার পরিচয় জানিয়েছে অতসী। কতবার অভিলাষ লিখেছে এবং অতি কঠোর ভাষাতেই লিখেছে যে, তোমার কথা আমার মনেও পড়ে না, তোমাকে আমি শুধু স্টোরবাবুর মেয়ে বলেই মনে করি, জীবনের কোন ভুলেও তোমার উপর আমার মনে ভালবাসা-টাসা দেখা দেবে না, দিতে পারে না। তুমি পাগলামি ক'রে আমাকে জ্বালিও না। কিন্তু উত্তরে অতসী শুধু লিখেছে, তুমি এত মহৎ, এত বড় প্রেমিকের মন তুমি কোথায় পেলে অভিলাষ?

প্রতুল বাবু আশ্চর্য হন।—কিন্তু আমি যে আপনার লেখা চিঠি পড়েছি অভিলাষবাবু।

—কি পড়েছেন? কি আছে তাতে?

—এই কথা যে, আপনি অতসীকে অর্থাৎ অতসীর জন্য আপনার মন··· সত্যিই একটা আশার পথ চেয়ে···।

—তাহ'লে আমার লেখা চিঠি দেখেননি, কোন্ জোচ্চোরের লেখা যত সব ঠাট্টার চিঠি পড়েছেন! আমি বাংলা ভাষায় চিঠি লিখি না, লিখতেও পারি না।

চুপ ক'রে আর ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকেন প্রতুলবাবু। অভিলাষ বলে—চিঠিগুলো পুলিশের হাতে দিয়ে দিন। পুলিশ খোঁজ ক'রে বের করতে পারবে, এসব কার কীর্তি।

চলে যাচ্ছিলেন প্রতুলবাবু। অভিলাষই আর একবার ডাক দিয়ে বলে। —বুঝতে পারছি, মিস বিশ্বাসেরও তেমন কোন দোষ নেই। আমার লেখা চিঠি পেলে উনি এতটা ভুল করতেন না। যাই হোক, ওঁর লেখা চিঠিগুলি ওঁরই হাতে দিয়ে দেবেন। এই নিন।

চিঠির বাণ্ডিল হাতে নিয়ে এই শীতের বিকালেই ঘর্মাক্ত হয়ে ঘরে ফিরেছেন প্রতুলবাবু।

—কাছে আয় অতসী! অতসীকে ডাকতে গিয়ে প্রতুলবাবুর গলার স্বরে যেন একটা ভয়ার্ত স্নেহের বেদনা কেঁপে ওঠে। কাছে ছুটে আসে অতসী। সব কথা বলেন প্রতুলবাবু, এবং চুপ ক'রে পাথরের মত শুধু দুটো চোখ নিয়ে সব কথা শোনে অতসী, তার পরেই দু'হাতে চোখ ঢাকা দেয়।

প্রতুলবাবুও তাঁর চোখ দুটোকে দু'হাতে ভাল ক'রে ঘষে নিয়ে বলেন—অভিলাষের কোন দোষ নেই অতসী! কেউ তোকে ঠাট্টা করার জন্য ঐসব মিথ্যে কথা চিঠিতে লিখেছে। আর, তুই সে-সব কথা বিশ্বাস করেছিস।

না, অভিলাষবাবুর দোষ হবে কেন? অতসীর কাছ থেকে হঠাৎ সেই গায়ে পড়ে লেখা প্রথম চিঠি পেয়ে ভদ্রলোক ভয় পেয়েছিলেন, এবং বিরক্ত হয়ে তাঁর প্রতিবাদ স্পষ্ট ক'রেই সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সে-চিঠি পায়নি অতসী, কিন্তু তার জন্য অভিলাষকে দোষী করা যায় না। একটি সত্য বুঝতে আজ আর ভুল করে না অতসী। তার কালো মুখের ভয়ে সবাই যখন সরে যায়, তখন অভিলাষ চৌধুরীর মত মানুষই বা সরে যাবে না কেন? বড়লোকের ছেলে একটা ভদ্রতার খেয়ালে বাবু কলোনির একটি মেয়েকে একা দেখতে পেয়ে শুধু একটা প্রশ্ন করেছিল, এইমাত্র। অতসীই হঠাৎ এক লোভের ভুলে মাথা খারাপ ক'রে অভিলাষের কাছে গিয়ে সঙ্গিনী হতে চেয়েছিল। অভিলাষ ডাকেনি অতসীকে। সেই রাতে পথের উপর একাকী দাঁড়িয়ে-থাকা জীবনের সব ঘটনা মনে পড়ে অতসীর। কোন দোষ যদি হয়ে থাকে, সে-দোষ হলো একমাত্র অতসী নামে এই কালোমুখ মেয়েরই মনের লোভ।

কিন্তু এমন ঠাট্টা করলো কে? পাটনা থেকে যে খামের চিঠিতে এত ধিক্কার আর গালাগালি ছুটে আসতো, সেই খামের ভিতরেই এত ভালবাসার ভাষা ছড়িয়ে দিয়েছে কে? এ যেন কাঁটা সরিয়ে ফুল ছড়িয়ে দেওয়া। অদ্ভুত ঠাট্টা! মিথ্যে ক'রে এত সুন্দর ভালবাসার কথা লিখতে পারে কোন্ নিষ্ঠুর মানুষ? ভাবতে অদ্ভুতও লাগে, এমন ভালবাসার কথা এত মিথ্যে একটা মন দিয়ে তৈরী করাও যায়?

অতসীও জানে, কেমন ক'রে যেন শুনেই ফেলেছে অতসী, কলোনির ক্লাবের আসরে বুড়ো ভদ্রলোকেরাও কি ভাষায় তার নামে ঠাট্টা জমিয়ে আনন্দ পায়। যে বেহায়া কালোমুখের মেয়েকে অনায়াসে ছেলেধরা ব'লে ঠাট্টা করা যায়, তাকে ঠাট্টা করার জন্য স্তবের মত অমন সুন্দর সুন্দর কথার মালা গাঁথবার দরকার তো হয় না।

ভাবতে গিয়ে মনটা যেন হাঁপাতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে অতসী। জীবনের বেহায়া লোভের সব চঞ্চলতাও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর বেণীতে ফুল জড়াবার দরকার হবে না। পথের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকালেও কেউ আর এই কালোমুখের উপর মায়া দেখাতে আসবে না।

অতসীর ক্লান্ত মনের বেদনার ভার যেন হঠাৎ চমকে ওঠে। কি যেন মনে পড়েছে অতসীর। কিন্তু বিশ্বাস করতে লজ্জা পায় অতসী। তা'ও কি সম্ভব?

প্রতুলবাবু ডাক দিয়ে বলেন—পাটনার সেই চিঠিগুলি দে তো অতসী!

আতঙ্কিতের মত তাকিয়ে অতসী বলে—কেন বাবা?

প্রতুলবাবু বলেন—পুলিশের হাতে চিঠিগুলি দিয়ে আসি। যে লোক ঠাট্টা ক'রে এরকম একটা কাণ্ড বাধালো, তাকে ধরে ফেলাই উচিত, আর তার শাস্তি হওয়াও উচিত।

অদ্ভুত রকমের চোখ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে অতসী—কি সর্বনাশ!

প্রতুলবাবু আশ্চর্য হন।—কি বলছিস রে?

যেন জীবনের পথের ধুলায় কুড়িয়ে পাওয়া কতগুলি হীরা-মাণিক আর মুক্তাকে, যেন অজানা এক স্বপ্নলোক থেকে ঝরে-পড়া কতগুলি সুরভির ফুলকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় অতসী। অনুরোধ করে অতসী—ওসব চিঠি পুলিশের হাতে দেবার কোন দরকার নেই বাবা! আমার অপমান আমার কাছেই লুকিয়ে পড়ে থাকুক।

প্রতুলবাবু—তাহ'লে লোকটাকে ধরবো কেমন ক'রে?

অতসী কি যেন ভাবে, তার পরেই বলে—ধরা পড়বার হলে একদিন ধরা পড়েই যাবে।

বড়দিনের ছুটি ফুরিয়েছে। অভিলাষ আছে পাটনায়। কি আশ্চর্য, অতসী আবার চিঠি লেখে অভিলাষের কাছে। লিখতে গিয়ে হেসে ফেলে অতসী।—তোমার কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাব ব'লে আশা করিনি। তুমি আমাকে ভালবাস না, এই দুঃখ সহ্য ক'রে বেঁচে থাকার চেয়ে আমার মৃত্যু বরণ করাই ভাল। এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবার আগেই আমি এই জগৎ হতে বিদায় নেব! আজই সন্ধ্যায়, যখন কলোনির ঘরে ঘরে

আলো জলবে, তখন আমি বরাকরের দহের গভীর জলের কোলে চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়বো।

চিঠি নিজের হাতে ডাকের বাক্সে ফেলে দিয়ে আসে অতসী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে অতসী। অতসী আজ যেন কিসের এক আশার উল্লাসে নিজের মনটাকে নিয়ে পাগলামির খেলা খেলছে। বিকাল শেষের আলোকে শালবনের মাথা রাঙিয়ে দিয়ে পশ্চিমের লাল আকাশও ধীরে ধীরে রঙ হারাতে থাকে। সন্ধ্যা হয়ে আসে। বেণীতে ফুল জড়ায় অতসী।

পুলিশের দরকার নেই। অতসী আজ নিজেই তাকে ধরে ফেলতে চায়, যে মানুষ এতদিন ধরে তার সব চিঠির ভিতর থেকে কাঁটা সরিয়ে শুধু ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে। অতসীও ঠাট্টা করতে জানে। সেই গোপন রহস্যের বুকটাকে ব্যথিত আর উদ্বিগ্ন ক'রে তুলতে হবে, তাই তো এতগুলি মিথ্যা কথার কাঁটা পাঠিয়ে দিল অতসী। উপায় নেই, অনেক ভেবে, এবং আর একবার লজ্জার মাথা খেয়ে এই কারসাজি করতে বাধ্য হয়েছে অতসী। তাকে যে ধরতেই হবে। তাকে যে একবার দেখতে ইচ্ছা করে। সে কি অতসীর মিথ্যা কথার টানে অতসীকে মিথ্যা মৃত্যু থেকে বাঁচাবার জন্য সত্যিই ছুটে আসবে না?

হাসতে গিয়েও চোখ মোছে অতসী। শেষকালে এই কালোমুখের জীবনটাকে পাগলামিতেই পেয়ে বসলো বোধ হয়।

কলোনির ঘরে ঘরে সন্ধ্যার আলো জলে। আর বেশি দেরি করে না অতসী। শালবনের পাশে পাশে লাল কাঁকরের নতুন সড়ক ধরে বরাকরের সেই গভীর দহের কাছে পৌঁছে যেতেও দেরি হয় না।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অতসী। এক সঙ্গিহীন একাকী জীবনের অভিমান যেন থমকে রয়েছে। হঠাৎ ভয় পায় অতসী। বড় বেশি ভয়। যেন নিজের মনের যত পাগলামি, লোভ, বেহায়াপনা আর লজ্জাহীন দুঃসাহসগুলিকে দেখতে পেয়েছে। ছিঃ, নিজেকে নিয়ে এরকমও খেলা করে মানুষ!

ফিরে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয় এবং দু'পা এগিয়েও যায় অতসী। তার পরেই থমকে দাঁড়ায়। শিউরে উঠতে থাকে অতসী। সত্যিই যে একটা ছায়াময় মানুষের মূর্তি ছুটে আসছে তারই দিকে।

ব্যস্তভাবে হন-হন করে হেঁটে একেবারে অতসীর চোখের সামনে এসে-

দাঁড়ায় সেই মূর্তি। নিশ্বাসের হাঁপ কোন মতে সামলে নিয়ে প্রশ্ন করেন এক ভদ্রলোক।—এ কি? আপনি এখানে একা দাঁড়িয়ে আছেন?

অতসীর কালোমুখের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছে একটা কালোমুখেরই মানুষ, যার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখার মত কিছু নেই, শুধু দেখা যায়, ভদ্রলোকের চোখ দুটো বড় স্বচ্ছ আর সরল।

দু' হাতে মুখ ঢাকে অতসী। পরেশনাথ বলে—আপনি তো আমাকে চেনেন। সেই যে সেই রাত্রিতে আমি আপনাকে একা দেখতে পেয়ে···।

এত কথা বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বেশ ভাল ক'রেই মনে পড়েছে অতসীর, এই পরেশনাথই সে-রাতে অতসীর একাকিত্বের ভয় দূর করার জন্য অন্ধকারের পথে সঙ্গী হতে চেয়েছিল। এই মানুষটিই তো রোজ বিকালে নিত্যদিনের ব্রতের মত অতসীর বাড়ির বারান্দার দিকে তাকিয়ে চলে যেত। চেনা মানুষ বৈকি। কিন্তু আজ যে অতসীর কাছে একেবারে নতুন ক'রে নিজেকে চিনিয়ে দিল পরেশনাথ। ধরা পড়ে গিয়েছে পরেশনাথ।

অতসী বলে—অন্য কথা বলবার আগে একটি কথা বলে নিন পরেশবাবু। কে আপনি? কি করেন আপনি?

পরেশনাথ—আমি আপনাদের কলোনির ডাকঘরের ক্লার্ক।

অতসী—এইবার বুঝলাম। কিন্তু আপনি কেন আমাকে ঠাট্টা করার জন্য মিছামিছি এতগুলি চিঠি লিখলেন?

পরেশনাথ কুণ্ঠিত ভাবে বলে—ঠাট্টা করার জন্য নয়, বিশ্বাস করুন।

অতসী—তবে কিসের জন্য?

পরেশনাথ—পাটনার চিঠিগুলি পড়ে বড় খারাপ লাগতো। সেই শক্ত চিঠিগুলি পড়লে আপনি কষ্ট পাবেন মনে করেই আমি···।

অতসী—তাই বলে আপনি কতগুলি মিথ্যে ভালবাসার কথা লিখবেন? আর কিছু লিখবার ছিল না?

পরেশনাথের কালোমুখ করুণ হয়ে ওঠে।—কথাগুলি তো মিথ্যে নয়।

অতসী—ওগুলি তো আপনার মনের যত মিথ্যে কথা।

পরেশনাথ বলে—না।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে পরেশনাথ। অতসী চেঁচিয়ে ওঠে।—তবে কি? সত্যি কথা?

পরেশনাথ—হ্যাঁ।

চেঁচিয়ে হাঁপিয়ে আর ছটফট ক'রে কথা ব'লে যেন একটা অবিশ্বাসের সঙ্গে মরিয়া হয়ে লড়াই ক'রতে চায় অতসী। —আপনি মুগ্ধ হয়েছেন আমার মুখ দেখে? আমাকে চিরকাল ভালবাসতে পারলে আপনি সুখী হবেন?

পরেশনাথ বলে—হ্যাঁ।

আবার দু'হাতে মুখ ঢাকা দেয় অতসী। কালোমুখের জন্য জীবনে কোন দিন কারও চোখের সামনে দাঁড়াতে লজ্জা পায়নি যে অতসী, সেই অতসী আজ যেন লজ্জায় তার কালোমুখ লুকোতে চাইছে। যেন সত্যিই দেবতার চোখের সামনে পড়ে অসহায়ের মত ছটফট করছে অতসীর যত লোভের আর ভুলের জীবন। ভগবান যদি প্রসন্ন হয়ে এখন অতসীকে কোন বর দান করতে চান, তবে শুধু এই প্রার্থনাই করবে অতসী, আজ অন্তত এক মুহূর্তের মত এই মুখকে সুন্দর ক'রে দাও ভগবান! সে মুখ দেখে পরেশ বাবুর চোখ আরও মুগ্ধ হয়ে যাক্।

অনেকক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে অতসী বিশ্বাস। তারপর রুমাল দিয়ে চোখ মোছে। তার পরেই হেসে ফেলে—আপনি কি মনে করেছেন পরেশ বাবু, আমি এখানে সত্যিই মরতে এসেছি?

সহসা উত্তর দিতে পারে না পরেশনাথ। কি যেন বলতে চায়?

অতসী—ব'লেই ফেলুন না, কিসের জন্য এখানে আমি মরতে এসেছি? অভিলাষ চৌধুরীর ভালবাসা পেলাম না ব'লে?

পরেশনাথের নীরব মুখের উপর সেই বেদনার্ত ছায়াটা হঠাৎ যেন আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। অতসী আবার হেসে ফেলে—আমি কারও জন্য মরতে আসিনি পরেশবাবু, আমি বাঁচতে এসেছি।

খুশি হয়ে হেসে ওঠে পরেশনাথের কালো মুখের মধ্যে সেই দুটো স্বচ্ছ চোখ—তার মানে?

অতসী হাসে—আপনাকে ধরে ফেলার জন্যই এসেছি! আমার আজকের একটা একেবারে মিথ্যে কথার চিঠিকে আপনি বড় বেশি বিশ্বাস ক'রে ধরাও দিয়ে ফেললেন পরেশবাবু!

পরেশনাথের স্বচ্ছ ও সরল চোখের দৃষ্টি হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়। যেন লজ্জিত হয়েছে পরেশনাথের স্বচ্ছ চোখ, এবং সেই লজ্জায় যেন একটু বেদনাও আছে। অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে পরেশনাথ। এতক্ষণে যেন মনের একটা উদ্বেগের ভার ঘুচে গিয়েছে, কিন্তু আর এক

উদ্বেগের ভার সহ্য করতে না পেরে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে পরেশনাথের মন।

পরেশনাথ বলে—তা'হলে এবার আমি যাই?

অতসীর গলার স্বর ছলছল করে।—কেন? আমাকে বোধ হয় বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না, কেমন?

উত্তর দেয় না পরেশনাথ।

অতসী—সে-রাতে আপনার চোখের কাছ থেকে ভুল ক'রে একটা মিথ্যের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম ব'লে?

পরেশনাথের মনটাও যেন হঠাৎ ব্যথা পেয়ে ছটফট ক'রে ওঠে।—না না, আমাকে ও-রকম মনের লোক ব'লে মনে করবেন না।

অতসী—সে ভুলের শাস্তি তো আমি পেয়েছি পরেশবাবু!

উত্তর দেয় না পরেশ। খলখল ক'রে হেসে ঘাসের উপর বসে পড়ে অতসী—ভাগ্যিস সে ভুল ক'রেছিলাম।

পরেশ বলে—তাহ'লে আজকের মত আমাকে যেতে বলুন।

অতসী—আপনি যেতে পারবেন?

উত্তর দেয় না পরেশনাথ। অতসী বলে—একটু বসুন পরেশবাবু।

পরেশনাথ—কিন্তু বাড়ি ফিরতে আপনার অনেক দেরি হয়ে যাবে যে!

অতসী—হোক না দেরি, আজ আর পথের অন্ধকারকে ভয় করবো না।

পরেশ—কেন?

অতসী—আপনি যে সঙ্গেই থাকবেন।

পাহাড় পরেশনাথের পায়ের কাছ থেকে ঢালু ধ'রে ধ'রে আমলকির বন যেখানে এসে শেষ হয়েছে, সেখানে বেশ ঘন ছায়া জমিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শিশু আর সেগুনের ছোট একটা ভিড়; তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে হলদে রঙের ডাকবাংলো; এবং এই ডাকবাংলোরই হাতার লতা-জড়ানো বেড়ার কাছাকাছি এসে বাঁ দিকে ঘুরে গিয়েছে কাঁকর-ছড়ানো গিরিডি রোড।

ছোট ডাকবাংলো। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায়, পরেশনাথের পাথুরে মাথা জড়িয়ে একটা কালো মেঘ ধোঁয়াটে হয়ে ঝুলছে। বৃষ্টি হবে বোধ হয়।

বাংলোর মধ্যে পাশাপাশি মাত্র চারটি কামরা; তিনটি কামরাই খালি। শুধু একটি কামরার দরজার কড়াতে, আজ তিনদিন হ'ল, সুতো দিয়ে বাঁধা কার্ড ঝুলছে। কার্ডের উপর লাল পেনসিলে লেখা—মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চক্রবর্তী।

কিন্তু বৃষ্টি হ'ল না। আজ তিনদিন হ'ল রোজ সকালে যেমন হয়, আজ সকালেও তেমনি, হঠাৎ ঝড়ের হাওয়া ছুটতে আরম্ভ করে, মেঘের ঘোর কেটে যায়, আর ঝলক দিয়ে রোদ ছড়িয়ে পড়ে আমলকির বনের উপর। যেমন এই তিনদিন, তেমনি আজও বেড়াতে বের হয়ে যান মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস চক্রবর্তী। অর্থাৎ, এন চক্রবর্তী ও তাঁর স্ত্রী স্বস্তিকা চক্রবর্তী।

বাংলোর গাড়ি-বারান্দা থেকে ছুটে বের হয়ে যায় চক্রবর্তী-দম্পতির মোটর গাড়ি, নতুন মডেলের একটি টুরার। গাড়ির নম্বর হ'ল পাঞ্জাব জলন্ধরের একটি নম্বর।

ড্রাইভার এই সময় বাংলোর খানসামার ঘরে খাটিয়ার উপর প'ড়ে ঘুমোতে থাকে। গাড়ি ড্রাইভ করেন স্বয়ং এন চক্রবর্তী। স্বামীর পাশে, স্বামীর সঙ্গে বড় বেশী গা ঘেঁসে ব'সে থাকেন স্বস্তিকা চক্রবর্তী। স্বস্তিকার মাথাটা সুন্দর একটি নেট জড়ানো খোঁপা নিয়ে আধভাঙা বোঁটার ফুলের মত এলিয়ে পড়ে এন চক্রবর্তীর কাঁধের উপর।

গাড়ি চালান এন চক্রবর্তী, কিন্তু গাড়ি থামে স্বস্তিকা চক্রবর্তীর ইচ্ছায়। পৃথিবীর বুকের উপর এমন একটি ভাল জায়গায় এসে কিছুক্ষণ থামতে আর থাকতে চায় স্বস্তিকা, যেখানে আরও অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে নিজেকে স্বামীর বুকের কাছে আরও আপন ক'রে দিতে পারা যায়।

এন চক্রবর্তী হঠাৎ গাড়ির স্পীড মৃদু ক'রে দিয়ে বলেন, এই তো একটা ভাল জায়গা, এর চেয়ে নির্জন জায়গা আর হতে পারে না স্বস্তি।

স্বস্তিকা বলে, ধেৎ!

এন চক্রবর্তী আশ্চর্য হন: ধেৎ কেন?

স্বস্তিকা। দেখছ না, একটা রাখাল ছোঁড়া গাছটার তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।

এন চক্রবর্তী। তাতে কি হয়েছে?

স্বস্তিকা। না, এখানে থেমে কোন লাভ হবে না। এর চেয়ে বরং ডাকবাংলোটাই ঢের বেশী ভাল জায়গা। চল, ফিরে যাই।

এই হ'ল এন চক্রবর্তীর আর স্বস্তিকা চক্রবর্তীর বেড়াতে যাওয়া আর বেড়িয়ে আসা। এবং এই ছোট হলদে রঙের ডাকবাংলোটাও সত্যিই বেশ ভাল জায়গা। তাই তো মাত্র এক ঘণ্টার জন্য থাকতে এসে এই ডাকবাংলোতে তিন দিন ধ'রে থেকেই গিয়েছে দু'জনে। স্বস্তিকারই ইচ্ছা, আরও কটা দিন থেকে যেতে হবে। তিনটি কামরাই খালি, ডাকবাংলোর বুক জুড়ে বড় সুন্দর আর বড় মিষ্টি একটা নির্জনতা যেন থমথম করে। বারান্দার উপর প'ড়ে আছে একটি মাত্র চেয়ার এবং ওই এক চেয়ারের উপর স্বামীর সঙ্গে ইচ্ছামত আর যেমন খুশি তেমনি ক'রে ব'সে থাকতে পারে স্বস্তিকা। কোন বাধা নেই। ঘণ্টা না বাজলে খানসামাও কখনো হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে না।

আজ তিন দিন হ'ল যেমন রোজ সকালে তেমনি আজও সকালে বেড়িয়ে ফিরে আসেন এন চক্রবর্তী ও স্বস্তিকা, স্বামী আর স্ত্রী, জলন্ধরের সব চেয়ে বেশি নামকরা সার্জন এন চক্রবর্তী ও লুধিয়ানার সব চেয়ে বড় ফার্মাসির মালিক এস ভট্টাচার্যের শ্যালিকার মেয়ে স্বস্তিকা।

আজ মাত্র এক মাস হ'ল বিয়ে হয়েছে স্বস্তিকার। যে বয়সে বিয়ে হ'লে ভাল হয়, তার চেয়ে বেশ একটু বেশি বয়স হয়েছে স্বস্তিকার। স্বস্তি পেয়েছে, ধন্য হয়েছে, সুখী হয়েছে, স্বস্তিকার জীবন। মনে হয়েছে স্বস্তিকার, আট বছর ধ'রে লুধিয়ানাতে এসে লুকিয়ে প'ড়ে-থাকা জীবনের একমাত্র আশা এতদিনে সফল হয়েছে। ব্যর্থ হয় নি তার বয়সের প্রতীক্ষা।

ডাকবাংলোর বারান্দার উপর উঠেই স্বস্তিকার এতক্ষণের উল্লাস-চঞ্চল দুটি চোখের দৃষ্টি হঠাৎ অপ্রসন্ন হয়ে একটি কামরার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ একজন এসেছে। লোকটাকে একটু বেহায়া ব'লেই মনে হয়। আরও দুটো কামরা খালি প'ড়ে থাকতে, লোকটা বেছে বেছে

ঠিক স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশার নীড় এই সবুজ রঙের কামরাটিরই পাশের কামরায় এসে ঠাঁই নিয়েছে। কার্ড ঝুলছে বন্ধ দরজার কড়াতে—পরিতোষ গাঙ্গুলী, টিম্বার মার্চেণ্ট।

এন চক্রবর্তীর চোখে কৌতুকের হাসি ফুটে ওঠে: কি ভাবছ স্বস্তি? এ জায়গার চেয়ে সেই জায়গাটাই তো ভাল ছিল, কেমন?

উত্তর দেয় না স্বস্তিকা। এন চক্রবর্তী হেসে ফেলেন: আর ক'দিন এখানে থাকতে চাও স্বস্তি?

স্বস্তিকার মনের অপ্রসন্নতা যেন ঝংকার দিয়ে বেজে ওঠে: আর এক মিনিটও না।

পাশের কামরার বন্ধ দরজা হঠাৎ খুলে যায়। দু'বার জোরে জোরে গলা কেশে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ান এক ভদ্রলোক। সিল্কের গেঞ্জি গায়ে, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, তাঁতের ধুতি পরা এক ভদ্রলোক।

কে জানে কেন, বোধ হয় আলাপ করার জন্য ঘরের ভিতর থেকে বের হ'য়ে এসেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু বের হয়েই যেন থমকে গিয়েছেন। কোন কথা বললেন না ভদ্রলোক। স্বস্তিকার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন, তার পরেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বোধ হয় পরেশনাথের চূড়ার আলো-ঝলসানো রূপ আরও ভাল ক'রে দেখবার জন্য বারান্দার ওই প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন টিম্বার মার্চেণ্ট পরিতোষ গাঙ্গুলী।

এক হাত দিয়ে এন চক্রবর্তীর একটা হাত বড় বেশি শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকে স্বস্তিকা। আস্তে আস্তে বলে: ঘরের ভেতর চল।

এন চক্রবর্তী আবার হাসেন: কি হ'ল?

স্বস্তিকা বলে, না, সত্যিই আর এক মিনিটও না। চল, এখুনি এখান থেকে স'রে পড়ি।

এন চক্রবর্তী: এখুনি মানে আজকের দিনটা কাটিয়ে কাল সকালে, এই তো?

স্বস্তিকা ছটফট ক'রে ওঠে: না না, এখুনি, এইমাত্র চ'লে যেতে হবে। ড্রাইভারকে ডাক, জিনিসপত্র গাড়িতে তুলুক। খানসামাকে ডেকে বিল চুকিয়ে দাও।

ঘরের ভিতরে ঢুকে ঝুপ ক'রে একটা চেয়ারের উপর ব'সে পড়েন এন চক্রবর্তী। মুখের পাইপে ছোট ছোট টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়েন, মাঝে মাঝে শিস দেন আর পা দোলাতে থাকেন।

ঘরের ভিতরেও ওই একটি মাত্র চেয়ার। ওই চেয়ারে স্বামীর সঙ্গে পা ঘেঁষে বসবার জন্য দু' পা এগিয়ে যাবার আগেই স্বস্তিকার পা দুটো যেন ট'লে ওঠে। দরজার কপাট বন্ধ ক'রে দিয়ে, বন্ধ কপাটের উপর পিঠ ঠেকান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন শ্রান্ত ক্লান্ত ও ভীত দেহের আলস্যভার কোন মতে সামলে রাখবার চেষ্টা করছে স্বস্তিকা।

এন চক্রবর্তী বলেন, কিন্তু আমার যে আজই সন্ধ্যায় একবার গিরিডি পর্যন্ত দৌড়ে আসবার কথা।

শিউরে ওঠে স্বস্তিকার চোখের পাতা: হঠাৎ গিরিডিতে কিসের দরকার হ'ল?

এন চক্রবর্তী: আমার বন্ধু লেফটেন্যাণ্ট জয়সোয়ালের বিয়ে।

স্বস্তিকা আতঙ্কিতের মত চেঁচিয়ে ওঠে: না, আমি একা থাকতে পারব না।

এন চক্রবর্তী: তা হ'লে তুমিও চল।

স্বস্তিকা: না, না, তুমি তো জানই যে আমি লোকজনের ভিড় সহ্য করতে পারি না, তবে মিছে কেন ওসবের মধ্যে আমাকে যেতে বলছ?

এন চক্রবর্তী: কিন্তু…।

স্বস্তিকা: কিন্তু-টিন্তু কিছুই নেই। এখান থেকে এখুনি সোজা ফিরে চল জলন্ধরে। আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম, এদিকে বেড়াতে এসো না, ঈস্ট ইণ্ডিয়া আমার মোটেই ভাল লাগে না।

—এটা একটা নতুন কথা বটে, এই প্রথম শুনলাম। হাসি-মুখেই স্বস্তিকার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে তারপর হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন এন চক্রবর্তী এবং বোধ হয় ভাবতে থাকেন, স্বস্তিকার মনে তা হ'লে আরও একটা বাতিক আছে। বিয়ে হবার পর এই এক মাসের মধ্যে স্বস্তিকার মন আর মেজাজের অনেক কিছু জানবার সঙ্গে সঙ্গে এন চক্রবর্তী শুধু এইটুকুই জেনেছেন যে, লোকের চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না স্বস্তিকা। ভিড়ের চোখের সামনে পড়লেই যেন ছটফট করে স্বস্তিকা, লোকের চোখের দৃষ্টি সত্যিই যেন ওর গায়ে বিঁধছে। অনেক ঠাট্টা ক'রেও স্বস্তিকার মনের এই বাতিক আজও সারাতে পারেন নি এন চক্রবর্তী।

—বড় বেশি তাড়াতাড়ি করতে বলছ স্বস্তি। এখন মাত্র সকাল নটা, না খেয়েদেয়ে এখুনি রওনা হ'লে—।

স্বস্তিকার মুখের দিকে তাকিয়েই একটু চমকে ওঠেন এন চক্রবর্তী।

ভয়-পাওয়া রোগীর চোখের মত চোখ, স্বস্তিকা অদ্ভুত চোখের দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে আছে তাঁরই মুখের দিকে।

—কি ? জ্বর-টর হ'ল নাকি ?

—জ্বরের মতনই লাগছে। খুব মাথা ধরেছে।

—তাই বল। শুয়ে পড় এখুনি। আমি মনে করলাম, তুমি তোমার মনের বাতিকে ওই একটা বাজে লোকের তাকানিতে রাগ ক'রে আর ভয় পেয়ে একেবারে একটা···ইয়ে হয়ে গেলে···বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়েই ফেললে।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে, তার পরেই শরীরটাকে যেন ঝুপ ক'রে হঠাৎ একটা আছাড় খাইয়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়ে স্বস্তিকা। আঁচলটা টেনে মুখের উপর আলগা ক'রে ছড়িয়ে দেয়। কী ভয়ানক সত্য কথা স্বস্তিকার স্বামী এন চক্রবর্তীর মুখে নতুন একটা আদালতের রায়ের মত ধ্বনিত হয়েছে ! ওই লোকটা সত্যই যে সেই বাজে লোকটা, আট বছর আগে যে লোকটা স্বস্তিকার মুখের দিকে শেষবারের মত তাকিয়েছিল। সেই রকমই সিল্কের গেঞ্জি ; সেই রকমই তাঁতের ধুতি, আর সেই ধরনেরই হরিণের চামড়ার চটি। আট বছরের মধ্যেও কোন অপঘাতে মরে যায়নি লোকটা।

কেমন ক'রে এখানে এল লোকটা ? লোকটা কি দৈববাণী শুনেছিল যে, আলিপুরের সেই দোতলা বাড়ির মেয়েকে একদিন এই হলদে রঙের ডাকবাংলোর ভিতরে পাওয়া যাবে ?

মাটির একটা রঙিন পুতুলকে যত সহজে গুঁড়ো ক'রে আর ধুলো ক'রে দিতে পারা যায়, আজ স্বস্তিকার এই সুখের জীবনকে তার চেয়েও সহজে ধুলো ক'রে দিতে পারে লোকটা। তার জন্য স্বস্তিকার গায়ে একটা টোকা দিতেও হবে না, শুধু কয়েকটা কথা এন চক্রবর্তীর কানের কাছে ব'লে দিয়ে চ'লে গেলেই হ'ল। আট বছর আগের আলিপুর দায়রা-জজের আদালতের একটি মামলার রায়। বাস্, তার পর মুখের উপর থেকে এই আঁচল সরিয়ে তাকালে স্বামীকে এই ঘরের মধ্যে আর কি দেখতে পাবে স্বস্তিকা ? এই বিছানার উপর স্বস্তিকাকে এই ভাবেই একটা দুঃস্বপ্নের দুঃসহ ক্লেদের মত ফেলে রেখে এন চক্রবর্তী তাঁর টুরার নিয়ে ছুটে চ'লে যাবেন জলন্ধর।

আসছে বোধহয় ; হরিণের চামড়ার চটি বাংলোর বারান্দার উপর উল্লাস ক'রে শব্দ ছটফটিয়ে ছুটে আসছে। সেই শব্দ শুনে স্বস্তিকার কানের কাছে ঘাম হয়ে ফুটে উঠেছে শরীরের ভয়ার্ত রক্তের কণাগুলি।

স্বস্তিকার আঁচল-ঢাকা মুখটা আস্তে একবার ফুঁপিয়ে ওঠে। হাতের বইয়ের

উপর থেকে চোখ তুলে স্বস্তিকার দিকে তাকিয়ে এন চক্রবর্তী বলেন: ঘুমোবার চেষ্টা কর স্বস্তি। বেশ ভাল একটা স্বপ্ন দেখলে সব মাথাধরা সেরে যাবে।

না, কেউ এল না। বন্ধ দরজার কড়া শব্দ ক'রে বেজে উঠল না। বোধ হয় আর একটু পরেই আসবে। অসহায়ের মত সব পরিণাম দৈবের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়ে শান্ত হতে চেষ্টা করে স্বস্তিকা, এবং ঘুমোতেও চেষ্টা করে। ঘুম আসে না ঠিকই, কিন্তু আট বছর আগের সেই ঘটনার ছবিগুলি যেন টুকরো টুকরো স্বপ্নের মত চোখের উপর ভাসতে থাকে।

পরিতোষ গাঙ্গুলী নয়, ওর নাম হ'ল রতন গাঙ্গুলী। পুরনো নাম ফেলে দিয়ে নতুন নামের আড়ালে জীবনটাকে লুকিয়ে বোধ হয় পৃথিবীর এই দিকের গোপন আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে লোকটা।

স্বস্তিকা নামটাও যে নিতান্ত নতুন একটা নাম, নামটার বয়স আট বছরের বেশী নয়। আট বছর আগের সেই আলিপুরের দোতালা বাড়ির মেয়ে রেবা মজুমদারই নতুন নামের আবরণ জীবনের উপর জড়িয়ে নিয়ে আর স্বস্তিকা মজুমদার হয়ে লুধিয়ানার মেসো মশাইয়ের বাড়িতে এতদিন ছিল। মাত্র এক মাস হ'ল স্বামীর পাশে দাঁড়াবার পর স্বস্তিকা মজুমদার হয়েছে স্বস্তিকা চক্রবর্তী।

আলিপুরের সেই দোতলা বাড়িতে মামা-মামীর আদরে বেশ ভালই তো কাটছিল বাপ-মা-মরা মেয়ে রেবা মজুমদারের জীবন।

বাইশ বছর বয়সের সব অহংকার আর কল্পনা নিয়ে গান গেয়ে গেয়ে আর বি. এ ফাইন্যালের পড়া প'ড়ে প'ড়ে, মুখটাকে সুন্দর ক'রে রাঙিয়ে আর শরীরটাকে নানা ছাঁদে সাজিয়ে সুখের দিনগুলি তরতর ক'রে পার হয়ে যাচ্ছিল। তার পরেই হঠাৎ সেই ঘটনা।

ঘরের ভিতরের নীরব স্তব্ধতাকে সন্দেহ ক'রে চমকে ওঠে আর ধড়ফড় ক'রে বিছানার উপর উঠে বসে স্বস্তিকা! লোকটা কি সত্যিই এরই মধ্যে ঘরের ভিতরে এসে এন চক্রবর্তীর কানে কানে সেই হিংস্র গল্পটা ফিসফিস ক'রে শুনিয়ে দিয়ে চ'লে গিয়েছে?

না, আসে নি লোকটা। দেখতে পায় রেবা, এন চক্রবর্তী তেমনি মন দিয়ে বই পড়ছেন, আর দরজাটা তেমনি বন্ধ আছে। কিন্তু বুঝতে পারে না রেবা, রেবার উপর প্রতিশোধ না নিয়ে থাকতে পারবে কেমন ক'রে ওই রতন গাঙ্গুলী?

কল্পনা করতে পারে রেবা, এই ঘরের দরজার বাইরে বারান্দার উপর এখন পা টিপে টিপে ঘুরছে প্রতিশোধের একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা। এন চক্রবর্তী এই ঘরের বাইরে যাওয়া মাত্র ওই প্রতিজ্ঞা হেসে হেসে এগিয়ে এসে এন চক্রবর্তীর কানের কাছে সেই রাক্ষুসে ঘটনার গল্পটা ব'লে দেবে। এই ঘরের ভিতরে আসবার দরকার হয় না, রেবার জীবনের ভালবাসার মানুষটাকে শুধু একটু একা আর আড়ালে পেতে চায় রতন গাঙ্গুলী।

এন চক্রবর্তী বই বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়ান। চেঁচিয়ে ওঠে রেবা, কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

এন চক্রবর্তী : যাই, ড্রাইভারকে ব'লে দিয়ে আসি, গাড়ির ইঞ্জিনটাকে একটু ভাল ক'রে চেক ক'রে রাখুক।

রেবা : না, যেতে হবে না। কখ্খনো যেয়ো না।

এন চক্রবর্তী আশ্চর্য হন : তার মানে ?

রেবা : তুমি এখানেই আমার কাছে ব'সে থাক, লক্ষীটি। দেখেও বুঝতে পারছ না কেন, মাথাধরাটা আমাকে কি রকম জ্বালাচ্ছে ?

চেয়ারের উপর ব'সে আবার বই হাতে তুলে নিলেন এন চক্রবর্তী। তারপর বলেন, এতটুকু ঘুমোলে ভাল স্বপ্ন দেখা যায় না, আর মাথাধরাও ছাড়ে না স্বস্তি।

স্বপ্ন না দেখলেও আট বছর আগের সেই জীবনকে এখন যে স্বপ্নেরই মত মনে হচ্ছে রেবার।

বসিরহাটের অত বড় বাড়িটা বিক্রি ক'রে দিয়েও সব দেনার দায় মিটাতে পারেন নি মামা। বিক্রি করবার আর কিছুই ছিল না। দেউলে হয়ে গিয়ে আর বসিরহাট থেকে সবাইকেও সঙ্গে নিয়ে চ'লে এসে আলিপুরের সেই দোতলা বাড়িতে যেদিন উঠলেন মামা, সেই দিন মামী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত বড় বাড়ির ভাড়া আসবে কোথা থেকে আর দিন চলবেই বা কেমন ক'রে ?

বিছানার উপর ব'সে ব'সেই টলতে থাকেন মামা। বিছানার উপরেই মামার হাতের কাছে কাঠের একটা ট্রে, তার উপর হুইস্কির বোতল আর গেলাস। গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে, আর কোলের উপর একটা বালিশ টেনে নিয়ে মামা এলোমেলো সুরে বলতে থাকেন, আমি সেই সুখময় চৌধুরী, আমি জানি কি ক'রে দিন চালাতে হয় মঙ্গলা।

চুপ ক'রে থাকেন মঙ্গলা। সুখময় চৌধুরী আবার বলেন, আমার

বাবার মুহুরী ছিল যার বাবা, ওই বিনোদ গাঙ্গুলী যদি এত স্টাইল আর চটক দেখিয়ে দিন কাটাতে পারে, তা হ'লে আমিই বা পারব না কেন ?

মঙ্গলা জানেন, এর মধ্যে একটা সত্য কথা বলেছেন তাঁর স্বামী। এই দোতলা বাড়ির চোখের সামনেই রাস্তার ওপারে ওই মস্ত চারতলা বাড়িতে থাকেন যে বিনোদ গাঙ্গুলী, তাঁর বাবা একদিন এই সুখময় চৌধুরীর বাপের মুহুরী ছিলেন। কিন্তু সেই গাঙ্গুলীরাই দিন দিন উঠেছে আর এই চৌধুরীরা পড়েছে। একই গ্রামে ওদের দেশ। মুহুরীর ছেলে বিনোদ গাঙ্গুলীই বিলেত থেকে পাস ক'রে এসে ত্রিশ বছর ধ'রে বড় বড় চাকরি করেছে, আর নিজের রোজগারের টাকায় এত বড় বাড়ি তুলেছে। কিন্তু মুহুরীর বড়-বাবুর ছেলে সুখময় চৌধুরী বাপের আমলের বাড়ি বেচে দিয়ে আর দেউলে হয়ে এই দোতলা বাড়ির ভাড়াটে হয়েছে।

প্রথম মাসটা কষ্টেই কেটেছিল। কিন্তু তার পরেই আর নয়। সুখময় চৌধুরী সত্যিই প্রমাণ ক'রে দেখিয়ে দিলেন যে, এক পয়সা রোজগার না ক'রেও স্টাইল ক'রে থাকবার আর নিত্য হুইস্কি খাবার বিজ্ঞান তিনি জানেন। তেজ বাহাদুর, ভীম বাহাদুর আর বংশীলাল—তিন চাকরের কোন চাকরকেই বিদায় দিতে হ'ল না। নতুন রেডিও আর গ্রামোফোন কিনলেন, একটা বিলিতী কুকুরও কিনে ফেললেন। কুকুরের জন্য চৌরঙ্গীর দোকান থেকে বিস্কুট কিনে আনতে যায় ভীম বাহাদুর।

রেবা বলে, আমি তা হ'লে বি. এ. ফাইন্যালের জন্য তৈরী হই মামা।

সুখময় চৌধুরী বলেন, নিশ্চয়ই।

রেবার জন্য প্রাইভেট টিউটরও রেখে দিলেন মামা। প্রতি মাসে একশো টাকা নেন প্রাইভেট টিউটর।

রবিবারের সন্ধ্যায় সিনেমা ছবি দেখতে যায় রেবা। কিন্তু যেতে আসতে বড় কষ্ট হয়। মামার কাছে এসে অভিযোগ করে রেবা, ট্রাম-বাসে যাওয়া-আসা করতে বড় বিশ্রী লাগে মামা।

সুখময় চৌধুরী বলেন, এবার থেকে ট্যাক্সি ক'রে যাবি, সঙ্গে যাবে তেজ বাহাদুর।

রেবা একদিন বলে, ট্যাক্সিও একটা ঝঞ্ঝাট। একটা গাড়ি কিনে ফেল না মামা ?

সুখময় চৌধুরী বলেন, এইবার কিনেই ফেলব বোধ হয়।

সুখময় চৌধুরীর ডাইনে বাঁয়ে সর্বক্ষণ গেলাস-ভর্তি হুইস্কি ছলছল করে,

মাথাটা সর্বক্ষণ ঝুঁকেই রয়েছে, যেন গ'লে গিয়েছে মেরুদণ্ডটা। এক মুহূর্তের জন্তও বাড়ির বাইরে যান না। কিন্তু এই বাড়ির সব ক্ষুধা তৃষ্ণা আর দরকারের দাবী পূর্ণ করবার জন্ত তাঁর হাতের কাছে থোকা থোকা নোট এসেই যাচ্ছে। আদরের ভাগ্নী রেবার সব স্টাইলের আশা ও আবদার মিটিয়ে দিচ্ছেন সুখময় চৌধুরী।

রেবা হেসে হেসে বলে, আমি যদি বিলেত গিয়ে পড়াশুনা করতে চাই মামা ?

সুখময় চৌধুরী বলেন, বেশ তো, তার ব্যবস্থাও ক'রে দেব।

রেবা মজুমদারের জীবনের অনেক আশা ও অনেক কল্পনা মত্ত হয়ে রেবার মনটাকেও মাতিয়ে রাখে সর্বক্ষণ। এই সুখের জীবনের মধ্যে শুধু একটা উপদ্রব দিনের মধ্যে অন্তত তিন-চারবার রেবার মনটাকে দুঃসহ যন্ত্রণা দিয়ে উত্ত্যক্ত করে। সামনের চারতলা বাড়ির বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতনের চোখের দৃষ্টি। সারা দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই বাড়ির ভিতরে আসবেই রতন, আর অন্তত দুবার এই বাড়ির ফটকের কাছে এসে দাঁড়াবে ও চ'লে যাবে। ওর চোখ দুটো যেন সারাক্ষণ একটা পিপাসার রোগে ভুগছে; দিনের মধ্যে তিন-চারবার রেবা মজুমদারের সুন্দর মুখটার দিকে তাকাতে না পারলে ওর চোখের রোগের জালা যেন শান্ত হয় না।

রেবা মজুমদারের মনটাও জ'লে ওঠে। মামার উপরেও রাগ হয়। গল্প করবার জন্ত পৃথিবীতে আর লোক পান নি মামা। থার্ড ক্লাস না ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, বিদ্যা আর এগোয় নি; দু-বেলা কুস্তি আর কসরৎ করে, বেহায়ার মত রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ভীম বাহাদুরের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে। সন্ধ্যা হলে থিয়েটারের ক্লাবে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্ত চন্দ্রগুপ্ত হয়ে গর্জন ক'রে। এই তো ওর মনুষ্যত্ব। এই মানুষের সঙ্গে গল্প ক'রে মামা কী যে আনন্দ পান কে জানে!

বারান্দার সামনে এক টুকরো খোলা জমির উপর পাতাবাহারের কয়েকটা কেয়ারি, আর একটা শিউলি গাছ। সেই শিউলির কাছে নিশ্চিন্ত মনে সন্ধ্যাবেলাটা একবার দাঁড়াতেও পারে না রেবা মজুমদার। দেখতে পায় রেবা, ঠিকই, আর কেউ নয়, সেই রতনই ফটক পার হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠল, আর সোজা মামার ঘরের দিকে চ'লে গেল। তাঁতের কোচানো ধুতি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটি, গায়ে শুধু একটা সিল্কের গেঞ্জি; ভদ্রতাসম্মত একটা জামা ও পরতে ভুলে গিয়েছে ওই

অশিক্ষিতটা। যেন এই বাড়িরই কত আপন জন। স্বচ্ছন্দে আসে আর স্বচ্ছন্দে চ'লে যায়।

রেবার সঙ্গে কথা বলতে কোনদিন ভুলেও সাহস করে নি রতন। যদি সে সাহস কোন দিন করে রতন, তবে রেবাও কি করবে সেটা মনে মনে জেনেই রেখেছে রেবা। তখুনি ভীম বাহাদুরকে ডেকে ব'লে দেবে রেবা, এই ভদ্রলোক কী বলছেন শোন।

কিন্তু ভীম বাহাদুরকে ডাকবার দরকার হয়নি এখনো। মুখে নয়, রতনের চোখেই যত দুঃসাহস। অযোগ্যের আকাঙ্ক্ষার লোভ। গাছের অনেক উপরের একটা ফোটা শিউলির দিকে শুধু লুব্ধভাবে তাকিয়ে থাকার মত মূর্খতা। যেন শুধু ওরকম ক'রে তাকালেই দয়া ক'রে সেই শিউলি টুপ ক'রে ওর বুকের উপর ঝ'রে পড়বে। কী যন্ত্রণা! রেবার মুখের দিকে রতন তাকালেই মুখ ফিরিয়ে নেয় রেবা। রেবা মজুমদারের সব কল্পনার অহংকারে শেষ পর্যন্ত ঘেন্না ধরিয়ে দেবে এই লোকটার ওই বিশ্রী আশার দৃষ্টি। নিরেট একটা লিপ্সা যেন রেবার সুন্দর মুখের আর শিক্ষিত রুচির মান-সম্মান ধ্বংস করবার জন্য সব সময় সুযোগ খুঁজছে। রতন গাঙ্গুলীর ছায়ার দিকে তাকাতেও ঘেন্না করে রেবার।

রেবা জানে না, মামা সুখময় চৌধুরী রেবার বোঝবার অনেক আগেই বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতনের ওই চোখের আশা আর ইচ্ছাকে বুঝে ফেলেছেন। অশিক্ষিত রতনের চোখের সেই লুব্ধতা ও মুগ্ধতার, সেই আশা ও ইচ্ছার সুযোগ নিতে একটুও দেরি করেন নি বসিরহাটের দেউলে জমিদার সুখময় চৌধুরী, হুইস্কির লোভে স্যাঁতসেতে হয়ে যাঁর জীবনের মেরুদণ্ড গ'লে গিয়েছে। তাই রতন গাঙ্গুলীর হাত থেকে থোকা থোকা নোট আর থলিভরা টাকা পেয়েই যাচ্ছেন সুখময় চৌধুরী। এই তিন মাসের মধ্যে একটি বারের মতও 'না' করে নি রতন।

তোয়ালে তুলে ভেজা ঠোঁট মুছে নিয়ে সুখময় চৌধুরী বলেন, আমার জীবনে টাকার আর কি দরকার! আমি তো একরকমের সন্ন্যাসী হয়েই গিয়েছি। রেবার জন্যই বলছি। সাজতে ভালবাসে মেয়েটা, সাজলে মানায়ও সুন্দর। অন্তত হাজার পাঁচেক পেলে রেবার জন্য একটা জড়োয়া সেট অর্ডার দিতে পারি।

রতন বলে, কবে টাকা পেলে চলতে পারে?

সুখময় চৌধুরী: আজই দাও না।

রতন বলে, অন্তত একটা দিন সময় পেলে ভাল হয়।

সুখময় চৌধুরী : বেশ, তাহ'লে কালই টাকা পৌঁছে দিয়ো।

প্রায় প্রতিদিনই, সুখময় চৌধুরীর চোখের সামনে এসে ব'সে এই রকমই গল্প শোনে চারতলা বাড়ির ছেলে রতন গাঙ্গুলী। গল্প শুনতে একটু ভয়-ভয়ও করে রতনের। কিন্তু গল্পের মধ্যে রেবার দরকারের দাবীটা মুখ খুলে ফেললেই সেই গল্প রূপকথার মত মিষ্টি হয়ে যায়। এই তিন মাসের মধ্যে যতবার যত টাকা চেয়েছেন সুখময় চৌধুরী, ততবার তত টাকা এনে দিয়েছে রতন।

এর পরেই সেই সন্ধ্যা, কি সুন্দর বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল বৈশাখের সেই সন্ধ্যাটা! রেবা মজুমদার তার একলা ঘরের নিভৃতে ব'সে এসরাজ বাজিয়ে গান করে। বাড়ির পিছনের পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে ব'সে ভাং খায় আর গলা ছেড়ে হল্লা করে ভীম বাহাদুর ও তেজ বাহাদুর। চৌধুরী-গৃহিণী মঙ্গলা আছেন তাঁর পূজার ঘরে। আর বাইরের ঘরে সুখময় চৌধুরীর সঙ্গে গল্প করে রতন।

রতন কুণ্ঠিত ভাবে বলে, এত টাকা?

সুখময় চৌধুরী চেঁচিয়ে বলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এত টাকাই লাগবে। ওর কমে হয় কি ক'রে?

রতন : রেবা কি সত্যিই বিলেতে গিয়ে পড়াশুনা করতে চায়?

—তাই তো ওর ইচ্ছে। কিন্তু তার জন্যে আমাকেও তো এখন থেকেই টাকার যোগাড় ক'রে রাখতে হবে।

—আমার মনে হয়, রেবার বিলেত যাবার কোন দরকার নেই।

—হয়তো দরকার নাও হতে পারে। কিন্তু টাকাটা আমার চাই।

—আমার ইচ্ছা...।

—কি তোমার ইচ্ছা?

—অর্থাৎ আপনারই ইচ্ছা, অর্থাৎ আপনি সেই যে বলেছিলেন, আমার সঙ্গে রেবার বিয়ে দিতে চান, সে ব্যাপারে আর দেরি না হওয়াই ভাল।

—আহা! সে ইচ্ছে তো আছেই; এবং আমার সেই ইচ্ছা পূর্ণও করব একদিন। কিন্তু এই টাকাটা আমার অবিলম্বে চাই।

—এত টাকা কোথা থেকে পাব বুঝতে পারছি না।

—একটু ভেবে দেখ রতন, রেবার মত মেয়ে তোমার স্ত্রী হবে। স্ত্রীরত্নই হ'ল রত্ন, এর কাছে তোমার ওই ক'টা টাকা কত তুচ্ছ জিনিস বল তো?

—কিন্তু আমি যে বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছি চৌধুরী মশাই, আর টাকা পাওয়ার পথ বন্ধ।

—তাই নাকি? কি বললেন বিনোদবাবু?

—বাবা বললেন, তুমি আমার সই জাল ক'রে চেক কেটে ব্যাঙ্ক থেকে যে এতগুলি টাকা সরিয়েছ, তার জন্যে খুব বেশী দুঃখ করি না। কিন্তু বুঝতে পেরেছি, তুমি নিশ্চয় কোন খারাপ স্ত্রীলোকের সংসর্গে প'ড়ে লম্পট হয়েছ। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলেছেন বাবা।

সুখময় চৌধুরী মুখ বিকৃত ক'রে হাসেন: বিনোদটা ওই রকমই একটা অসভ্য।

ছ্যাঁক ক'রে যেন চমকে ওঠে রতনের চোখ: বাবার সম্পর্কে ওরকম ক'রে কথা বলবেন না চৌধুরী মশাই।

সুখময় চৌধুরী বলেন, আমি কিছুই বলতে চাই না, শুধু জানতে চাই টাকাটা কবে পাব।

রতন: আমার পক্ষে এত টাকা দেওয়া আর সম্ভব হবে না চৌধুরী মশাই। কিন্তু একটা উপায় হতে পারে।

—বল কি উপায়?

—আপনি যদি রেবাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার কাছে একবার যান, আর দরকারের কথাটা একটু বুঝিয়ে বলতে পারেন, তবে বোধ হয়…।

ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত কিছুক্ষণ রতনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন সুখময় চৌধুরী। তার পরেই ফ্যাঁস ক'রে চেঁচিয়ে ওঠেন, তোমার বাবা আমাকে টাকা দেবে? আমার কথা বিশ্বাস করবে তোমার বাবা! বিনোদ গাঙ্গুলী কি সেই কাঁচা লোক? সে মুহুরীর বাচ্চাকে কি আমি চিনি না?

রুষ্ট চিতা বাঘের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় রতন। এক থাবা দিয়ে সুখময় চৌধুরীর গলা টিপে ধরবার জন্য হাত বাড়ায়।

চিৎকার করেন সুখময় চৌধুরী: জলদি আও ভীম বাহাদুর, তেজ বাহাদুর। শালা আমাকে খুন ক'রে ফেলেছে।

খোলা ভোজালি হাতে নিয়ে ছুটে আসে ভীম বাহাদুর আর তেজ বাহাদুর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রতন। সুখময় চৌধুরীর মুখটা কাঁপতে কাঁপতে বীভৎস হয়ে ওঠে।

—মুহুরীর বাচ্চার বাচ্চা এই হতভাগা আমার গলা টিপে ধরতে চায়! বলতে বলতে হুইস্কির বোতল হাতে তুলে নিয়ে রতনের কপালের উপর

প্রচণ্ড এক আঘাত আছড়ে দিলেন সুখময় চৌধুরী। ঝঙ্কার দিয়ে চূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভাঙা বোতলের কাচ। রতনের কপালে আঁকা-বাঁকা একটা ফাটলের রেখা ভেদ ক'রে ফুটে উঠতে থাকে রক্তের বুদ্বুদ।

হাত দিয়ে কপাল টিপে ধ'রে ঘরের ভিতর থেকে ছুটে বের হয়ে যায় রতন। কিন্তু ফটক পর্যন্ত পৌছবার আগেই, শিউলির কাছে এসে হঠাৎ কাটা গাছের মত আস্তে আস্তে হেলতে হেলতে মাটির উপর প'ড়ে যায়।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতে থাকেন সুখময় চৌধুরী। তাকিয়ে থাকে ভীম বাহাদুর আর তেজ বাহাদুর। এসরাজ ফেলে ছুটে এসে বাইরের ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে রেবা মজুমদার।

সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীরটা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে। তার-পরেই ভয়ানক কর্কশস্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন সুখময় চৌধুরী, ম'রে গিয়েছে শালা।

ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে একটা ভিড় তাকিয়ে দেখতে থাকে, শিউলির কাছে রক্তমাখা-মাথা একটা মানুষ প'ড়ে আছে। চেঁচিয়ে ওঠে ভিড়ের লোক, পুলিস পুলিস। খুন খুন!

ছুটে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েন সুখময় চৌধুরী। সিরসির ক'রে কাঁপতে থাকে কুঁজো শরীরের পাঁজরাগুলো। ভূতের ভয়ে আতঙ্কিত ছোটছেলের মত চিৎকার ক'রে ওঠেন সুখময় চৌধুরী, রেবা! রেবা!

রেবা কাছে এসে দাঁড়ায়: কি হ'ল মামা?

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আর ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সুখময় চৌধুরীর বুকের ভিতর থেকে যেন একটা আধমরা প্রাণ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আর রক্ষে নেই রেবা। বিনোদ গাঙ্গুলী আমাকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে ছাড়বে না।

আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা, এ কি সর্বনেশে কথা বলছ মামা?

সুখময় চৌধুরী: রতন গাঙ্গুলীকে মেরেছি; ম'রেই গিয়েছে বোধ হয়। কিন্তু আমি বাঁচব কি ক'রে?

রেবা: কি করেছিল লোকটা?

ফটকের কাছে পুলিসের লরি এসে থেমেছে। জানলা দিয়ে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে পুলিসের মূর্তি দেখতে পেয়েই সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীরটা যেন এক বিভীষিকার ভয়ে টলতে টলতে দেয়ালের কোণের দিকে হেলে পড়তে থাকে। কিন্তু সামলে নেন। দেয়াল ধ'রে কোন মতে দাঁড়িয়ে থাকেন

সুখময় চৌধুরী। রেবার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করেন: রতন তোরই সর্বনাশ করতে এসেছিল।

ভ্রূকুটি ক'রে তাকায় রেবা: তার মানে?

সুখময় চৌধুরী তাঁর দাঁতের কাঁপুনি সামলাতে সামলাতে বলেন, তোকে নষ্ট করতে চেয়েছিল। তাই আমি ওকে মেরেছি।

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেবা বলে, ঠিক করেছ।

—পুলিসকে এই কথা তুইও বলবি রেবা। সোজা স্পষ্ট ভাষায় কোন পরোয়া না ক'রে বলে দিবি।

রেবা: নিশ্চয়ই বলব।

এগিয়ে আসছে পুলিস। শক্ত হয়ে আর দেয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে সুখময় চৌধুরীর কুঁজো শরীর। হঠাৎ ছটফট ক'রে যেন দমবন্ধ গলাটা দীর্ণ ক'রে ফুটে ওঠে সুখময় চৌধুরীর এক ভয়ার্ত আবেদন: শুধু এ কথা বললে আমি পার পাব না রেবা। আর একটু বাড়িয়ে বলতে হবে।

রেবা: কি বলতে হবে ব'লে দাও।

সুখময় চৌধুরীর ভীরু চোখের দৃষ্টিটা দপদপ করে: ওই ভয়ানক লোকটা তোকে নষ্ট ক'রেই দিয়েছে। জোর ক'রে, খুন করবার ভয় দেখিয়ে. তোর শরীরের সব লজ্জা আর সম্মান একেবারে শেষ ক'রে দিয়েছে।

—তাই ব'লে দেব মামা। অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে রেবা।

বারান্দার উপরে পুলিসের পায়ের শব্দ। সুখময় চৌধুরী বলেন, ওই ঘরের ভিতরে গিয়ে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে থাক্ রেবা। শিগগির যা। মনে থাকে যেন, রতন তোর খোঁপা ভেঙে দিয়েছে, তোর গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে দিয়েছে, তোর গায়ের শাড়ি লুটপাট ক'রে সরিয়ে দিয়েছে। তুই কত কেঁদেছিস, তবু রতন তোকে ছাড়ে নি।

স্বচক্ষে অনেক কিছুই দেখে নিল পুলিস স্বকর্ণে অনেক কথা শুনে নিল। রেবা মজুমদারের সম্ভ্রমহারা সেই বিধ্বস্ত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আর সুখময় চৌধুরীর মুখের সেই করুণ বিলাপ শুনে খুবই ব্যথিত হ'ল পুলিস অফিসারের চক্ষু। এত বড় ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে কত বড় পশু হতে পারে, বুঝতে পেরে আশ্চর্য হয়ে গেলেন অফিসার। যেমন মামা সুখময় চৌধুরী, তেমনি ভাগী রেবা মজুমদারের হাত বেশ স্বচ্ছন্দে সই ক'রে দিল স্টেটমেণ্টে, এক মুহূর্তের জন্যও হাত কাঁপে নি।

কিন্তু মরে নি বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে রতন গাঙ্গুলী। কপালের আঘাত

এমন কিছু সাংঘাতিক হয় নি। ক'দিন পরে জখম সেরে যাবার পরেও হাসপাতাল থেকে সোজা পুলিস-হাজতে চ'লে গেল রতন। এত বড় পাপের মামলার আসামী ওই ছেলের জামিন হতে রাজী হন নি বিনোদ গাঙ্গুলী।

কী আশ্চর্য! আসামী অপরাধ অস্বীকার করল না। সব সাক্ষীর সাক্ষ্য দায়রা-জজের আদালতের সব প্রশ্নের সম্মুখে সত্য ব'লে প্রমাণিতও হল। একটি কথা না ব'লে, একটুও বিচলিত না হয়ে, কোন আক্ষেপ প্রকাশ না ক'রে, চার বছরের সশ্রম কারাবাসের আদেশ বরণ ক'রে নিল রতন গাঙ্গুলী।

মামলার রায় বের হবার পর দশ দিনের মধ্যেই চারতলা বাড়ি বিক্রি ক'রে দিয়ে চ'লে গেলেন বিনোদ গাঙ্গুলী। কোথায় চলে গেলেন কে জানে?

কিন্তু সুখময় চৌধুরীর দোতলা বাড়িরও সব জানলা সব সময় বন্ধ। বাড়ির সামনের রাস্তার উপর যখন-তখন ছোট ছোট এক একটা ভিড় জ'মে ওঠে। জানলার দিকে তাকিয়ে থাকে জোড়া-জোড়া চোখের সতৃষ্ণ কৌতূহল। মামলার সেই বিচিত্র কাহিনীর নায়িকা যে থাকে এই বাড়িরই কোন একটি ঘরে!

এ কি হল? একদিন যেন রেবা মজুমদারের মনটাই হঠাৎ-ঘুম-ভাঙা শিশুর মত চমকে জেগে ওঠে আর ভয় পেয়ে চারদিকে তাকায়। জানলাগুলো কি আর এই জীবনে খোলা যাবে না? ওই চোখগুলো পথের উপর থেকে স'রে যাবে কবে? জেলের চেয়েও বেশী বন্ধ এই ঘরের বাইরের আলোতে এই মুখ নিয়ে কি আর দাঁড়াতে পারা যাবে? রেবার বিলেতে পড়তে যাবার কথা নিয়ে রেবার সঙ্গে আর কোন আলোচনা কেন করে না মামা? হঠাৎ এই রকম কঠিন একটা অসুখে পড়লো কেন, এবং হঠাৎ আবার পুরোহিত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত করে কেন মামা?

মামার কাছে এসে আর একবার আবদার করে রেবা: এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন একটা বাড়ি কিনে ফেল মামা।

কোন উত্তর দেয় না সুখময় চৌধুরী। এবং তারপর আর ক'টাই বা দিন? সুখময় চৌধুরী হুইস্কিলোভী মুখ চিরকালের মত নিরুত্তর হয়ে যাবার পর এবং আরও কয়েকটা দিনের বর্ষার ঘোর কেটে যাবার পর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় পূজোর ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে মামী বলেন, সেদিন তুই কি যেন জানতে চেয়েছিলি রেবা?

রেবা বলে, মারা যাবার কদিন আগে মামা প্রায়শ্চিত্ত করলো কেন?

—তা হ'লে শুনবি সব?

—সবই শুনব মামীমা।

মামীমা সবই বলেন, এবং সবই শোনে রেবা। রেবার চোখ দুটো পাথরের চোখের মত স্তব্ধ হয়ে থাকে। জোরে নিঃশ্বাস টানতে গিয়ে যেন একটা জ্বালা গিলে ফেলে রেবা। ছটফট ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা, তুমি কি অদ্ভুত কথা বলছ মামীমা!

মামী বলেন, হ্যাঁ রে মেয়ে, আমি যে শেষে তোর মামার মুখ থেকে সবই জানতে পেরেছি।

বন্ধ জানলা ঘরের ভিতর হাঁসফাঁস ক'রে দিনগুলিকে আর খুব বেশীদিন সহ্য করতে হয় নি রেবার। কাশী চ'লে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন মামী, এবং যাবার আগে রেবাকে লুধিয়ানায় মেসোমশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেবার সময় একটি কথা বললেন, এখান থেকে তোর এখন অনেক দূরে স'রে গিয়ে থাকাই ভাল রেবা, বাঁচতে যদি চাস।

লুধিয়ানা রওনা হবার সময় মামীকে প্রণাম করতেই রেবাকে আর একটা কথা বলেছিলেন মামী, পারিস যদি তুইও একটা স্বস্ত্যয়ন করিস রেবা।

আট বছর আগের সেই ঘটনার জ্বালা কি সত্যিই আজ স্বস্ত্যয়ন খুঁজছে? আমলকি-বনের হাওয়া জানলার পর্দা উড়িয়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে রেবার নেট-জড়ানো খোঁপার উপর ফুরফুর করে। চোখের পাতায় কেমন একটা ঠাণ্ডার শিহর, হাওয়া লাগলে বাসি চোখের জল যেমন স্নিগ্ধ হয়ে সিরসির করে। আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকায় রেবা।

এন চক্রবর্তী বলেন, ব'সে ব'সেই অনেকক্ষণ বেশ তো ঝিমোলে স্বস্তি।

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ বেশ ভাল ক'রে ঝিমিয়েছে রেবা। খানসামা এসে কখন খাবার দিয়ে চ'লে গিয়েছে, তাও টের পায় নি রেবা। সত্যিই, একটা স্বপ্নের পাল্লায় প'ড়ে মনটা যেন কোথায় চ'লে গিয়েছিল!

এন চক্রবর্তীর খাওয়া হয়ে গিয়েছে। একটা বাজলে খাবার খেতে আর এক মিনিটও দেরী করেন না এন চক্রবর্তী, তাঁর দশ বছরের অভ্যাসের রুটিন। কিন্তু রেবা শুধু খাবারগুলোকে ছোঁয়াছুঁয়ি ক'রে সামান্য একটু খেয়ে ব্যস্ত-ভাবে হাত ধুয়ে ফেলে।

রেবা যদি শপথ ক'রে স্বামীর কাছে বলে যে, সেই কাহিনী হ'ল এক স্নেহশীল মামাকে ফাঁসির মরণ থেকে বাঁচাবার জন্য এক আদুরে ভাগ্নির কতগুলি ভয়ানক মিথ্যা কথার কাহিনী, তা হ'লে? আদালতের সেই বিশ্বাসগুলি মিথ্যা, আর স্বস্তিকার এই কথাগুলিই শুধু সত্য, এতটা বিশ্বাস করবার মত কোন

মোহ এখনো ঘনিয়ে ওঠে নি জলন্ধরের সার্জনের মনে, স্বস্তিকার মুখ দেখে যতই মুগ্ধ হোক না কেন তার চোখ। তবু ভয় করবার কিছু নেই। শুনে হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই করুণা করবেন স্বামী এন চক্রবর্তী। মনে করবেন, শুধু আট বছর আগে একটা ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছিল স্বস্তিকার শরীরটা। নিগৃহীতা নারীর মনের বেদনাগুলি কল্পনা করতেও পারবেন। স্বস্তিকাকে তেমনি আগ্রহে বুকের কাছে টেনে আপন ক'রে ধ'রে রাখবেন। মিথ্যাই সারা সকালটা শুধু একটা মিথ্যা ভয়ে নিজেকে আতঙ্কিত করেছে, আর মাথাধরার জ্বালা সহ্য করছে রেবা।

আর ভয় নয়, কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন নতুন রকমের একটা ছট-ফটানি সহ্য করবার চেষ্টা করে রেবা। রেবার মনেরই ভিতরে কি যেন কিসের একটা ব্যস্ততা জেগে উঠেছে। দু-চোখের চাঞ্চল্যের মধ্যে যেন একটা ইচ্ছার বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে ঝিক ক'রে চমকে ওঠে। কি যেন বুঝতে চায় রেবার মন, কিসের একটা সন্দেহকে যেন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতে চায় রেবা।

এন চক্রবর্তী চেয়ারের উপরেই ঘাড় কাত ক'রে চোখ বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন। রেবা বলে, তোমাকে অনেকক্ষণ ঘরের ভেতর আটক ক'রে রেখেছি ব'লে রাগ করনি তো?

এন চক্রবর্তী চোখ বড় ক'রে তাকিয়ে আশ্চর্য হন: রাগের কোন প্রমাণ পেয়েছ না কি?

হেসে হেসে মিনতিমাখা স্বরে রেবা বলে, যাও, বাইরে গিয়ে একটু ব'স লক্ষীটি। তোমাকে এখানে অনেকক্ষণ মিছিমিছি বসিয়ে রেখে কষ্ট দিয়েছি।

এন চক্রবর্তী: আঃ, বলছি কোন কষ্ট হয় নি।

রেবা আবার হাসে: কিন্তু ভাবতে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে যে! অন্তত আমার মনের বাতিককে খুশি করবার জন্যে এই বারান্দাতেই কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে তারপর চ'লে এস।

পাইপ ধরিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দার উপর এদিকে থেকে ওদিকে আস্তে আস্তে হেঁটে আর শিস দিয়ে আনাগোনা করেন এন চক্রবর্তী, রেবা যেন তার কল্পনা থেকে কুড়োনো এক সুন্দর বিশ্বাসকে এক পরীক্ষার কাছে ইচ্ছা করেই পাঠিয়েছে। ওই তো, উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে রেবা, পাশের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শিস দিচ্ছে রেবার স্বামী। এই তো রতনের সুযোগ। তবু চুপ ক'রে ঘরের ভিতরে কেন ব'সে আছে রতন? এখুনি ছুটে বের হয়ে রেবার স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে দিচ্ছে না কেন,

স্বস্তিকা নামে এই নারী হ'ল পরপুরুষের লালসায় লাঞ্ছিত রেবা মজুমদার নামে এক নারী।

ঘরের ভিতরে ফিরে আসেন এন চক্রবর্তী। রেবার দুই চোখের তারায় অদ্ভুত এক কৌতূহলের উল্লাস জ্বলজ্বল করে: দেখা হ'ল ওঁর সঙ্গে?

—কার সঙ্গে?

—এই যে, যিনি এই পাশের ঘরেই রয়েছেন, টিম্বার মার্চেন্টের সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—কি বললেন ভদ্রলোক?

—ভদ্রলোক না অদ্ভুত লোক। কথা বলা দূরে থাক্, ভদ্রলোক একবার তাকালেনও না।

বাস্ আর কোন প্রশ্ন করবার দরকার নেই। যা সন্দেহ করেছিল রেবা, তাই সত্য হয়েছে। যে বিশ্বাস মনের মধ্যে পাওয়ার জন্য ছটফট করছিল, সেই বিশ্বাস এতক্ষণে পেয়ে গেল রেবা। রেবার স্বামীর কাছে নয়, রেবারই কাছে এসে কথা বলবার অপেক্ষায় আছে আর সুযোগ খুঁজছে রতন। এন চক্রবর্তীকে নয়, স্বস্তিকা চক্রবর্তীকেই একবার একা পেতে চায় রতন। বুঝতে পারে রেবা, পাশের ঘরে এখন নীরব হয়ে ব'সে রয়েছে যেন একটা প্রবল অভিমান। রাগ নয়, প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞাও নয়। রেবার সেই হিংস্র মিথ্যার আঘাতে ক্ষতাক্ত হয়েছে যার জীবনের সম্মান, সেই মানুষ আজও শুধু রেবারই কাছে এসে প্রশ্ন করতে চায়: তুমি আমার জীবনের উপর এতখানি বিষ ঢেলে দিলে কেন? কোন্ অপরাধে? তোমাকেই সুখে রাখবার জন্যে চোর হয়েছিলাম ব'লে? তোমার সুন্দর মুখের মায়ায় বড় বেশি লুব্ধ হয়েছিলাম ব'লে?

আসুক, সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে পারবে রেবা। শুনে যাক রতন, সেই মিথ্যা কথাগুলি রেবার মিথ্যা কথা নয়। জেনে যাক রতন, তার মত মানুষের চোখের আশাকে একদিন ঘৃণা করেছিল ব'লে আজও রেবা তার নিঃশ্বাস দিয়ে একটা জ্বালাকে চুপ ক'রে বুকের ভিতরে গিলে গিলে শান্ত হতে চেষ্টা করে।

কোন সন্দেহ নেই, এক সুযোগে হঠাৎ ঘরের ভিতরে এসে একলা রেবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে রতনের মনের অভিমান ওই কয়েকটা প্রশ্ন করতে চায়। প্রশ্ন করতে কতক্ষণই বা সময় লাগবে? আধ মিনিটের বেশী নয়। উত্তর দিতে রেবারই বা কতটুকু সময় লাগবে? আধ মিনিটের বেশী নয়।

ভালই হবে, এক মিনিটের মধ্যে আট বছরের পুরনো একটা অশান্ত ক্ষোভ মিটে যাবে। রেবার কথা শুনে রেবাকে ক্ষমা ক'রে আর সুখী হয়ে চলে যাবে রতন, রেবার মনের জ্বালাও মিটে যাবে।

বিকালের চা দিয়ে যায় খানসামা। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ান এন চক্রবর্তী। রেবা প্রশ্ন করে, যাচ্ছ কোথায়?

এন চক্রবর্তী: যাই, লনের ওপর একটু বেড়িয়ে বেড়িয়ে চা খেতে ইচ্ছে করছে।

চ'লে যান এন চক্রবর্তী। এই ঘরের ভিতরে আসবার সুযোগ এইবার পেয়েছে রতন। অদ্ভুত একটা ছায়া-ছায়া হাসির আভা যেন হঠাৎ শিউরে উঠেছে রেবার ঠোঁটের উপর। রেবা তার ইচ্ছার ভাগ্যটা দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। ব্যস্তভাবে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পাউডারের কৌটা খুলে ফেলে রেবা। মিরারের সামনে দাঁড়ায়। ডান গালের নীচটায়, কপালের বাঁ দিকটায়, আর ঘাড়ের চারদিকে একটু পাউডার দরকার। তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে মুখের উপর এখানে-ওখানে পাউডারের পাফ বুলিয়ে নেয় রেবা।

বারান্দায় পায়ের চলার শব্দ শোনা যায়। হরিণের চামড়ার চটি মৃদু শব্দ ক'রে আনাগোনা করছে। রেবার বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে। কিন্তু তবু মুখটাকে হাসিয়ে নিয়ে মনটাকে প্রস্তুত ক'রে রাখে রেবা। রতন এসে হঠাৎ ঘরে ঢুকলে বোকার মত ভয়ে চমকে উঠবে না রেবা।

এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট। ঘরের ভিতরে এসে একলা রেবার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি কথা বলে চ'লে যাবার সুযোগ অনেকক্ষণ ধ'রে তো পেয়েই যাচ্ছে রতন, কিন্তু তবু আসে না কেন?

হঠাৎ একটা সন্দেহ চমকে ওঠে রেবার মনে। এবং সেই সন্দেহে ধীরে ধীরে বিহ্বল হয়ে উঠতে থাকে রেবার সুন্দর চোখের আনমনা আর অপলক দৃষ্টি।

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে রেবা, কিসের অভিমান এবং কেমন অভিমান রেবার এই ঘরের পাশেই এখন কি আশা ক'রে ব'সে আছে। আমলকি-বনের হাওয়া বড় বেশি ফুরফুর করে রেবার নেট-জড়ানো খোঁপার চারদিকে। এক মিনিট বা দু মিনিটের সুযোগ পাওয়ার জন্য কোন লোভ নেই ওই অভিমানের মনে। রতনের মনের ইচ্ছার গুঞ্জন যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে রেবার দুই কান। অবাধে, অনেকক্ষণ ধ'রে, দু চোখের দৃষ্টিতে যত খুশি তত লোভ মায়া আর মুগ্ধতা নিয়ে তাকাবার জন্য রতন আজ তার সেই রেবা মজুমদারের সুন্দর মুখটাকে চোখের সামনে পেতে চায়।

শিস দিতে দিতে ঘরের ভিতর ঢোকেন এন চক্রবর্তী। রেবা বলে, আচ্ছা, যদি তুমি এখুনি গিরিডি রওনা হও, তবে লেফটেন্যান্ট জয়সোয়ালের বিয়ে দেখে তোমার ফিরে আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে?

এন চক্রবর্তী বলেন, কত আর সময় লাগবে? চার-পাঁচ ঘণ্টার বেশী নয়। রাত দশটার মধ্যেই ফিরে আসতে পারব।

রেবা: তাই বল! মাত্র চার-পাঁচ ঘণ্টা! তা হ'লে যাও, ঘুরে এস।

এন চক্রবর্তী: আর দরকার নেই গিয়ে। আমার এমন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয় জয়সোয়াল যে ওর বিয়েতে যেতেই হবে।

রেবা: না না, যাওয়াই ভাল। যতই কম ঘনিষ্ঠ বন্ধু হোক না কেন, ভদ্রলোক যখন তাঁর বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন, তখন যাওয়াই উচিত।

এন চক্রবর্তী নতুন টাই হাতে তুলে নিয়ে গলায় জড়াতে থাকেন: তা হ'লে যেতেই বলছ তুমি?

রেবা: এস। আমি এই চার-পাঁচ ঘণ্টা গলা ছেড়ে পাঞ্জাবী গজল চেঁচিয়েই পার ক'রে দিতে পারব।

এন চক্রবর্তীর টুরার কাঁকর-ছড়ানো গিরিডি রোডের ধুলো উড়িয়ে চ'লে যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসে! রেবার একলা ঘরের দেয়ালের গায়ে আলো ঝুলিয়ে দিয়ে চ'লে যায় খানসামা।

তাড়াতাড়ি ক'রে সাজতে গিয়েও বেশ একটু দেরি ক'রে ফেলল রেবা। সবুজ রঙের শাড়িটা যখন প্রায় অর্ধেক পরা হয়ে গিয়েছে, তখন হাত থামিয়ে কি-যেন ভাবে রেবা। না, রাতের আলোয় এই সবুজকে নিতান্তই কালো দেখাবে। অন্য রঙের শাড়ি বাছে রেবা। সাজ শেষ হবার পরেও মিরারের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। রেবার কপালটার গড়নে বেশ একটু খুঁত আছে, দু পাশে কেমন যেন চাপা-চাপা ভাব। এই খুঁত নিশ্চয়ই রতনের চোখে পড়ে নি কোনদিন। কাছে এসে রেবার সুন্দর মুখের দিকে তাকাবার সুযোগ জীবনে কোনদিন পায় নি তো রতন। শুধু দূর থেকেই দেখেছে। কিন্তু আজ যে রেবার কপালের এই খুঁত রতনের চোখে ধরা প'ড়ে যাবে। খুঁতটা ঢাকা দেবার জন্য কানের দু পাশে হাত রেখে খোঁপা চাপে রেবা।

ঘরের দরজা খুলে দিয়েছে রেবা। খোলা দরজা দিয়ে ঘরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বারান্দার উপর, যেন রেবার বিহ্বল মনের প্রতীক্ষাটাই পথের উপর আঁচল পেতে দিয়েছে। চেয়ারের উপর ব'সে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে রেবা। সোনার চেন দিয়ে কব্জি জড়িয়ে বাঁধা ছোট্ট

হাতঘড়ি। চলছে ব'লেই তো মনে হয়। কানের কাছে তুলে নিয়ে হাতঘড়ির শব্দ শোনে রেবা।

সারা পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি নির্জনতা কি আর কোথাও আছে? কোটি কোটি লোকচক্ষুর নাগাল থেকে ছিন্ন-করা এমন একটি নিভৃত?

বুঝতে পেরেছে রেবা, শুধু রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ত সুখী হবে না ওই অভিমানের মন। হতে পারে না। ওর চোখে যে বড় দুরন্ত একটা পিপাসা ছিল।

এসেই যদি হাত ধরে? যদি আদর ক'রে আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নেয়? যদি রেবার এই সাজানো দেহের উপর সব পিপাসা ঢেলে দেয় রতন?

ছটফট ক'রে একটা হাত তুলে কপাল টিপে ধরে রেবা। রেবাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সব চেয়ে বেশি সুখী হবার সব চেয়ে বেশি অধিকার যে ওরই ছিল।

পাশের ঘরে এলোমেলো শব্দ উসখুস করে। দরজা খোলার শব্দ শোনা যায়। বারান্দার দিকে তাকিয়ে হেঁটমুখ হয়ে ব'সে থাকলেও বুঝতে পারে রেবা, রতনের ছায়ার চঞ্চলতা এই ঘরের দরজার বড় কাছাকাছি এসে আবার চ'লে গেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের ওদিকের খাটের উপর এসে ব'সে থাকে রেবা। দুরু দুরু বুকের যত মিথ্যা ভয়ের শিহরগুলিকে দু' হাতে আঁকড়ে ধ'রে চুপ করিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। ভয় করবার কি আছে? ওই মানুষকে কি ভয় করতে আছে? ও যে ভয়াল হতেই জানে না।

আসতে বড় দেরি করছে। আসে না কেন রতন? রেবাকে আদর করবার আর ইচ্ছামত সুখী হবার এমন অবাধ সুযোগ আর কবে পাবে রতন? রেবার বিহ্বল চোখের প্রতীক্ষার মধ্যে বেশ একটু অভিমানের ছায়াও ফুটে ওঠে।

সন্ধ্যা ফুরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। রাতের অন্ধকারে একেবারে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে পরেশনাথ। আমলকি-বনের ফুরফুরে হাওয়াই বা কোথায় চ'লে গেল? শুধু মৃদু ঝড়ের শব্দ ছড়ায় শিশু আর সেগুনের ভীড়।

ছলছল করতে থাকে রেবার চোখ। আর একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে রেবার মনে, এবং এইবার বুঝতে পেরেছে রেবা, এতক্ষণ ধ'রে রতনের আশা আর ইচ্ছাকে বুঝতে খুবই ভুল হয়েছে রেবার।

কাঠের বাঘ রাগ করে না, কিন্তু মাটির মানুষও অপমানিত হ'লে

বোধ হয় রাগ না ক'রে পারে না। তবে বিনোদ গাঙ্গুলীর ছেলে, অমন কুস্তিকরা হট্টাকট্টা একটা মানুষ, সেই রতন গাঙ্গুলীই বা কেমন ক'রে সেই অপমানের জ্বালা ভুলে যাবে? যে মেয়েকে এত ভালবেসেছিল আর উপকার করেছিল রতন, সেই মেয়েই রতনের জীবনের বুকে এক মিথ্যা অপবাদের ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। সেই মিথ্যা অপবাদকেই বর্ণে বর্ণে সত্য ক'রে দিয়ে চ'লে যাবার সুযোগ খুঁজছে রতন। এই রকমই একটি প্রতিশোধ না নিলে কেমন ক'রে তৃপ্ত হবে রতনের মত মানুষ, পুরুষের মত পুরুষ।

তবে কি ডাকাতের মত হঠাৎ এসে গলা টিপে ধরতে চায়? একটা অসহায় শরীরকে, একটা অনিচ্ছাকে, কতগুলি আর্তনাদকে, এক জোড়া চোখের সজল কান্নাকে, আর সাজসজ্জার সব লজ্জালুতাকে লুটপাট ক'রে সরিয়ে দিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হতে চায় ওই প্রচণ্ড অভিলাষ? চায় বইকি, নইলে শান্ত হতে পারে না রতন গাঙ্গুলীর আট বছরের অশান্ত আত্মার ক্ষোভ।

আজ আর পুলিস আসবে না; সেদিনের সেই মিথ্যা এজাহারের কাহিনীটাকে শুধু আর একবার অভিনয় করতে হবে। শুধু ইচ্ছা ক'রে একটা অনিচ্ছার ছলনা হয়ে যেতে হবে। অসহায়ের মত আর্তনাদ ক'রে আর চোখের জল ফেলে রতন গাঙ্গুলীর দস্যুতা বরণ ক'রে নিতে হবে। ওর ক্ষমাহীন প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞাকে সুখী ক'রে দিতে হবে। রতনের উগ্র চক্ষুর দিকে নকল জ্বালায় জ্বলন্ত দুই চক্ষুর দৃষ্টি হেনে মনে মনে হেসে উঠবে রেবা।

আসুক তা হ'লে। বিছানার উপর লুটিয়ে শুয়ে পড়ে রেবা, এবং শোয়া মাত্র একেবারে অসহায় হয়ে যায় রেবার দেহটা। মনে হয়, এখুনি ঘুমে জড়িয়ে যাবে চোখের পাতা। বুঝতে পারবে না রেবা, কখন রতন এসে ঘরের ভিতরে ঢুকে রেবার ঘুমন্ত অসহায় ও একলা প'ড়ে থাকা এই সাজানো রাঙানো সুন্দর মূর্তিটার উপর ক্ষুধার্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী হয়েছে।

ছিঃ, নিজেরই উপর রাগ ক'রে উঠে বসে রেবা! রতনের মত মানুষের মনকে বুঝতে গিয়ে এত ছোট মন নিয়ে এসব কি ছাই আবোল-তাবোল চিন্তা করছে রেবা! এ ভাবে রেবার কাছে আসবার মানুষ নয় রতন। রেবার মনটা যেন এতক্ষণ পাগলামি ক'রে রতনের মনের একটা অত্যন্ত সহজ সরল ও স্বাভাবিক ইচ্ছাকেই বুঝতে পারছিল না।

রেবার কাছে আসবার জন্য যতই ব্যাকুল হয়ে উঠুক না কেন রতনের মন, তবু আসবে কেন রতন, কোন্ সাহসে, রেবা যদি নিজে গিয়ে হাত ধ'রে না নিয়ে আসে?

এতক্ষণে রেবার সারা মুখের উপর হাসিভরা বিহ্বলতা একেবারে উচ্ছল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই হ'ল রতনের আশা! হাত ধ'রে ডেকে নিয়ে না এলে রেবাকে আর বিশ্বাস করা যায় না! বেশ তো, তাই হোক। তোমাকে হাত ধ'রে ডেকে আনতে পারলে যে আমাকেও নিঃশ্বাস দিয়ে সেই জ্বালা আর গিলতে হবে না কোনদিন।

আসছি আমি। —মনে মনে বলতে গিয়ে মুখ ফুটে প্রায় ব'লেই ফেলেছিল রেবা। বিছানা থেকে এক লাফ দিয়ে উঠে নেট-জড়ানো খোঁপাটাকে চটপট দুটো গুঁতো দিয়ে ছাঁদে বসিয়ে দেয়। তারপর আর এক মুহূর্তও দেরি করে না রেবা! ঘরের দরজা পার হয়ে বারান্দার উপরে এসে দাঁড়ায়। মুখচোরা অথচ প্রাণঢালা এক ভালবাসার আট বছরের অভিমান ভেঙে দেবার জন্য রেবার মুখেও যেন একটা দুষ্টু হাসির প্রতিজ্ঞা মিটমিট করে। রতনের ঘরের দিকে তাকায় রেবা।

দুই চোখ দুই হাতে ঢেকে ডুকরে চেঁচিয়ে ওঠে রেবা : খানসামা!

রতনের ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ তালা ঝুলছে দরজার কড়াতে। নেই, টিম্বার মার্চেণ্ট পরিতোষ গাঙ্গুলীর নাম লেখা সেই কার্ড আর নেই। কখন কোন ঝড়ের হাওয়ায় উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ওই কার্ড?

প্রায় দৌড়ে দৌড়ে চলতে থাকে রেবা। বারান্দা পার হয়ে ঘাসভরা লনের উপর নেমে, দূরের কিচেনের সেই কেরোসিনের আলোর দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে রেবা—খানসামা!

ছুটে আসে খানসামা : কি হুকুম মেম সাব?

—আমার পাশের ঘরের সেই বাবু কোথায়?

—গাঙ্গুলীবাবু?

—হ্যাঁ।

—এই তো থোড়া আগে চলিয়া গেলেন বাবু।

কি ভয়ংকর মানুষ! কি ভয়ানক প্রতিশোধ নিতে জানে লোকটা! রেবার বুকের গভীর থেকে উথলে-পড়া উৎসবের মত এত বড় ইচ্ছাটাকে যেন থেঁতলে দিয়ে, আছাড় মেরে আর চূর্ণ ক'রে পালিয়ে গেল লোকটা। আজ ওর কপালে বোতল ছুঁড়ে মারবার কেউ নেই। পুলিস নেই, হাজত নেই, জেল নেই।

আস্তে আস্তে বারান্দার বাতাস ঠেলে ঠেলে ঘরের দিকে চলে যায় রেবা। সারা গায়ে যেন দুঃসহ এক অপমানের কামড় লেগে রয়েছে।

অনিচ্ছার উপর দস্যুতা করলে অপমানের যে জ্বালা লাগে মনে, সে জ্বালা কি এই জ্বালার চেয়ে বেশী দুঃসহ।

ঘরের ভিতরে ঢুকে চেয়ারের উপর সুস্থির হয়ে ব'সে থাকতে চেষ্টা করে রেবা। কিন্তু পারে না। রতনের আজকের এই সত্যিকারের দস্যুতাকে যে অপরাধ ব'লেই মনে করে না পৃথিবীর শাস্ত্র। কোন্ পুলিসের কাছে এজাহার দেবে রেবা?

রেবার নিজেরই হাত দুটো যেন থেকে থেকে পাগল হয়ে উঠতে চাইছে। খোঁপা ভেঙ্গে দিয়ে, গলা টিপে দম বন্ধ ক'রে দিয়ে, পটপট ক'রে এক টানে এই শাড়ি আর ব্লাউজের সব লজ্জালুতা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রেবাকে পৃথিবীর এই নিভৃতে আট বছর আগের একটা এজাহার ক'রে মাটির উপরে লুটিয়ে দিতে চায়।

চেয়ার থেকে উঠে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়ে রেবা। বালিশের উপর ভেজা চোখ ঘ'ষে ঘ'ষে, আর জ্বালাভরা শরীরটাকে নিয়ে লুটোপুটি করতে করতে যখন ক্লান্ত হয় রেবা, তখন আমলকি-বনের হাওয়া আবার নতুন ক'রে রাতের বুক ঠাণ্ডা করতে আরম্ভ করেছে।

রাত দশটার কয়েক মিনিট আগেই গিরিডি থেকে ফিরে এলেন এন চক্রবর্তী। টুরারের হর্নের শব্দেও ঘুম ভাঙে না রেবার।

দরজা খোলা। ঘরে আলো। তবু বিছানার উপর এরকম অদ্ভুতভাবে ঘুমিয়ে প'ড়ে আছে কেন স্বস্তি? এ কি ছিরি? খোঁপাটা যেন নেট ছিঁড়ে ভেঙে পড়েছে, এলোমেলো কতগুলি চুলের কুণ্ডলী ছড়িয়ে রয়েছে বালিশের পাশে! শাড়িটার প্রায় সবটাই যে বিছানা বেয়ে মেঝের উপর ঝুলে লুটিয়ে রয়েছে। অমন সুন্দর চেহারাটাই যেন এই বিশ্রী ঘুমের ঘোরে বিধ্বস্ত হয়ে একটা লাসের মত প'ড়ে রয়েছে। এরকম ক'রেও মানুষ ঘুমোয়?

স্বস্তি!—বেশ জোরে চেঁচিয়ে ডাক দেন এন চক্রবর্তী।

ধড়ফড় ক'রে উঠে বসে স্বস্তিকা।

এন চক্রবর্তী হাসেন: এ কি?

স্বস্তিকা: কি?

এন চক্রবর্তী: মনে হচ্ছে, যেন একটা বাঘে তোমাকে খেয়ে চলে গিয়েছে।

স্বস্তিকা: খেয়ে গেল আর কোথায়? খেলে তো ভালই হ'ত।

এন চক্রবর্তী: কি বললে? কি ভাল হ'ত?

স্বস্তিকা হেসে ফেলে: তোমার তা হ'লে আবার একটা বিয়ে করতে হ'ত।

কোনকালে ওর গায়ের রং বেশ ফরসা টুকটুকে ছিল ব'লে মনে হয়, এখন অবশ্য রোদে পুড়ে আর জলে ভিজে একেবারে তামাটে হয়ে গিয়েছে।

ওর নাম মিস সুহাসিনী পল। ছেঁড়া একটা শাড়িকে, তাও আস্ত একটা শাড়ি নয়, শাড়ির আধখানা একটা টুকরোকে গাউনের মত ভঙ্গীতে গায়ে জড়িয়ে, তার উপর লম্বা একটা গরম কোট চাপিয়ে পথে পথে হেঁটে বেড়ায় মিস সুহাসিনী পল। আজ ওর বয়স ষাটের কম হবে না, এবং বুড়োরাই ব'লে থাকেন যে, বছর ত্রিশ আগেও ঐ সুহাসিনী পলকে আস্ত একটা সিল্কের গাউন প'রে আর চকচকে হাই-হিল জুতো ঠকঠকিয়ে এণ্টালির বাজারে মুর্গি আর ফুলকপি কিনতে তাঁরা দেখেছেন।

এখন পথ চলতে গিয়ে মিস সুহাসিনী পলের জীর্ণ-শীর্ণ ছোট্ট চেহারাটা ঠুকঠুক ক'রে কাঁপে। শীত গ্রীষ্ম বা বর্ষা, গায়ের উপর সব সময়েই ঐ লম্বা গরম কোট। গরম কোটের সারা গায়ের এখানে-ওখানে পশম ঝরে গিয়েছে, ঘিয়ে ভাজা কুকুরের ছালের মত দেখতে। পুরুষমানুষের পায়ের এক জোড়া জুতো, তা'ও ছেঁড়া আর রং-চটা, সুহাসিনী পলের দু'পায়ে যেন আলগা হয়ে লেগে রয়েছে। মাথার সব চুলই সাদা। সেই সাদা চুলের খোঁপার উপর কালো একটা চিরুনি গোঁজা, সেই চিরুনির সব দাঁতের প্রায় অর্ধেকই ঝরে পড়ে গিয়েছে।

ফ্যাকাসে একটা ছাতা আছে, আর আছে ময়লা একটা ঝোলা; এই দু'টি বস্তুও মিস সুহাসিনী পলের দুই হাতের দু'টি প্রয়োজনের শোভা। কিন্তু ঐ ময়লা ঝোলার ভিতরে আর একটি যে বস্তু আছে, সেই বস্তুটি জীর্ণ-শীর্ণ নয় এবং ছেঁড়া ময়লাও নয়। বেশ সাদা আর বেশ চকচকে কতগুলি ছোট ছোট কার্ড, কার্ডের উপর কালো হরফে ছাপা নাম—মিস সুহাসিনী পল।

বেশ একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে মিস সুহাসিনী পল। মুখের শুকনো চামড়ার ভাঁজে ভাঁজে যেন ভারবাহী বৃদ্ধ পশুর মত এক জীবনের যত ক্লান্তি আর বিরক্তি ঘর্মাক্ত হয়ে ফুটে ওঠে। যেন পায়ের নাল খুলে গিয়েছে, সুহাসিনী পলের দু'পায়ের নড়বড়ে জুতো দু'টোর দিকে তাকালে তাই মনে হয়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আর দু'পায়ের নড়বড়ে জুতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পথ চলে মিস সুহাসিনী পল।

কোন একটা বাঙ্গালী-পাড়ার ভিতরে গিয়ে ঢুকতে হবে এবং বেছে বেছে ভাল ভাল বাড়িগুলির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই হলো মিস সুহাসিনী পলের নিত্যদিনের কর্মসূচী। তাই বড় রাস্তার উপর আর বেশিক্ষণ নয়; হয় ডাইনে নয় বাঁয়ে কোন একটা ছোট রাস্তা কিংবা গলি ধরে চলতে থাকে সুহাসিনী পল, এবং হঠাৎ থেমে মুখ তুলে তাকায়। হ্যাঁ, টাকা পয়সা আছে এই বাড়িতে; কল্পনাও করে ফেলতে পারে সুহাসিনী পল, এই বাড়ির মনের ভিতরে দয়া-মায়াও আছে বোধ হয়।

তালতলার এক গলিতে দত্তবাবুদের বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ে সুহাসিনী পল। প্রথম ঘরের ভিতরেই চেয়ারের উপর বসে রয়েছে এক যুবক। এগিয়ে যায় সুহাসিনী পল। যুবকের চোখের কাছে নাম ছাপানো একটা কার্ড আচমকা এগিয়ে দিয়ে অভিবাদন জানায় সুহাসিনী পল।—গুড মর্নিং মাই বয়!

—কি চাই আপনার?

—চারিটি, ওল্ড লেডি আপনার কাছ থেকে চ্যারিটি আশা করে। মাত্র একটি দশ টাকার নোট, তার বেশি কিছু নয়।

কোন কোন বাড়ির লোক হেসে ফেলে, আবার কোন কোন বাড়ির লোক বেশ বিরক্ত হয়। কিন্তু বিরক্ত হোক কিংবা হেসেই ফেলুক, সকলেই যেটুকু চ্যারিটি করে, তার দাম এক আনার বেশি নয়; বড় জোর দু-আনা।

কিন্তু এই ইয়ংম্যান চকচকে একটা আধুলিকে সুহাসিনী পলের চোখের সামনে তুলে ধরলো। সুহাসিনী পল তবুও অপ্রসন্নভাবে মুখ বাঁকা ক'রে বলতে থাকে—তুমি এ কি করছো জেণ্টেলম্যান! আমি সত্যিই তো একটা বেগার উওম্যান নই। তোমার কাছ থেকে ঐ সামান্য একটা হাফ-রুপি আমি আশা করি না।

—এর বেশি হবে না। ইচ্ছা হলে নিন, নয়তো চলে যান।

সুহাসিনী পল গম্ভীরভাবে বলে—এত কড়া ক'রে কথা বলো না ইয়ংম্যান। ওল্ড লেডি তোমার কাছ থেকে একটু রেসপেক্ট আর কার্টসি আশা করে।

—এর বেশি দিতে পারবো না।

সুহাসিনী পলের অলস ও শিথিল দুই চক্ষুর তারা দুটো যেন ধিকি ধিকি ক'রে জলতে থাকে।—তুমি বোধ হয় জান না যে, আমার লেট গ্র্যাণ্ড ফাদার হলেন দি ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান ড্রিল মাষ্টার অব ইণ্ডিয়া। তুমি বোধ হয় জান না যে, আমার ফাদার মোহিট পল সিমলার সব চেয়ে বড়

পোলট্রির মালিক ছিলেন। তুমি নিশ্চয়ই জান না যে, আমিই ত্রিশ বছর আগে তোমার এই বাড়ির সামনের ঐ রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে বেড়াতে গিয়েছি। সেই মানুষকে তুমি সামান্য হাফ-রুপি দিয়ে তাড়িয়ে দিতে চাইছ?

যুবক বলে—এত কথা শুনবার আমার সময় নেই, আপনি যদি…।

আর বেশি বলতে হয় না। মিস সুহাসিনী পল তার গলার স্বরে যেন একটা কটকটে অভিমান কাঁপিয়ে বলে ওঠে—বেশ, তবে তাই হোক। গড ব্লেস ইউ!

হাত বাড়িয়ে খপ করে আধুলিটা তুলে নিয়ে ঝোলার ভিতর ফেলে দেয় সুহাসিনী পল। আর এক মুহূর্ত দেরী না করে চলে যায়; তার পর আবার সেই নড়বড়ে জুতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পথ চলতে থাকে।

আট আনা দিয়েছে এই বাড়ির ইয়ং লোকটা। মন্দ কি? আবার আসতে হবে এই বাড়িতে, কারণ, এক-আনা দু'আনার বেশি দেবার মত লোক যে এই পৃথিবী থেকেই সরে গিয়েছে।

এই ভাবেই নানা পাড়ার যত ভাল-ভাল চেহারার বাড়িতে চ্যারিটি যেচে বেড়ায় ওল্ড লেডি সুহাসিনী পল। কোন কোন পাড়ায় হঠাৎ পথের উপর দাঁড়িয়ে তীব্র স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। একটা কুকুর ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে সুহাসিনী পলের ছাতা কামড়ে ধরেছে। পাড়ার ছেলেরা দৌড়ে এসে কুকুরটাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সুহাসিনী পল শান্ত হয় না। আধ ঘণ্টা ধরে পথের উপর সেখানেই দাঁড়িয়ে আর চেঁচিয়ে পাড়াটাকে নানারকম অভিশাপ আর ধিক্কার দিয়ে তারপর অন্য পাড়ার দিকে চলে যায়।

আর একটা বাড়ি। এই বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে সুহাসিনী পল একটা মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করে। দশ বারটা ছোট ছোট অনাথ শিশুকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মানুষ জাতিকে একটু সার্ভিস না দিতে পারলে মনে শান্তি নিয়ে মরতে পারবে না সুহাসিনী পল। তাই তো এই বুড়ো বয়সে লোকের কাছ থেকে এত অপমান সহ্য করেও দরজায় দরজায় ঘুরে চাঁদা চাইতে হয়। মাত্র দশটা টাকা চাঁদা চায় সুহাসিনী পল।

বাড়ির লোক এক-আনা পয়সা দিয়ে বিদায় করে দেয়। আবার পথ চলতে থাকে সুহাসিনী পল। এবং সন্ধ্যার পর আর এই সব পাড়ার ভিতরে কোথাও তাকে দেখা যায় না। ঠিক সন্ধ্যার সময় কোন কোন

লোকের চোখ হঠাৎ দেখতে পায়, এণ্টালি বাজারের কাছে এক ল্যাম্প পোস্টের পাশে দাঁড়িয়ে ঝোলার ভিতর নানারকম জিনিস ভরছে সুহাসিনী পল। সেই সব জিনিসের মধ্যে একটা পাঁউরুটি আর দেশী মদের ছোট একটা বোতলও দেখা যায়।

তার পরে কোথায় চলে যায় মিস সুহাসিনী পল? এণ্টালি বাজারের দোকানদারেরাও ঠিক বলতে পারে না, কোন্ দিকের কোন্ গলিতে থাকে ঐ ভিক্ষুক বুড়িটা।

যেখানেই থাকুক এণ্টালি বাজারেরই কাছাকাছি পাড়াগুলির কোন না কোন পাড়াতে সকাল দুপুর ও বিকেলে ঐ বুড়িকে দেখতেই পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কোন বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাগ ক'রে একটা হল্লা জাগিয়েও তোলে সুহাসিনী পল। এক আনাও নয়, মাত্র দু'টো পয়সা দিয়েছে এই এত বড় একটা বাড়ি। সুহাসিনী পল বাড়ির চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আর শিথিল চক্ষুর অলস তারা দুটোকে ধিকি ধিকি ক'রে জ্বালিয়ে চেঁচাতে থাকে। ঐ বাড়ির মোটা মোটা থাম কি কোনদিন ধুলো হয়ে যাবে না? ঐ গাড়ির চাকা কি কোনদিন ভেঙ্গে পড়বে না? টাকা পয়সা থাকতে যারা চ্যারিটি করে না, তারা নরকে যাবে, তাদের টাকা পয়সাকে ডেভিলে খাবে।

আবার পথ চলতে থাকে সুহাসিনী পল এবং মনে পড়ে তালতলার গলির সেই বাড়িটাই সব চেয়ে ভাল বাড়ি! সেই বাড়ির সেই ইয়ং জেণ্টেল-ম্যান একটা আধুলি দিয়েছিল। ঐ বাড়ির মনে সত্যিই একটু চ্যারিটি আছে।

এখান থেকে বেশি দূরে নয় তালতলা, পৌঁছে যেতেও বেশি দেরি হয় না।

মাঝদুপুরের তালতলার সেই গলি বেশ নিস্তব্ধ হ'য়ে রয়েছে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে সেই ঘরেরই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পায় সুহাসিনী পল, ইয়ং জেণ্টেলম্যান নয়, তার বদলে এক প্রৌঢ়া লেডি চেয়ারের উপর বসে বই পড়ছেন।

মিস সুহাসিনী পলের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়েই মহিলা রাগ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলেন—তুমি আবার এসেছ?

সুহাসিনী পল বলে—না এসে উপায় কি? তোমাদের মত ভাল মানুষের কাছ থেকে দয়া মায়া আশা করি।

মহিলা বলেন—তুমি তো একটা ঠগ, একটা মিথ্যাবাদী।

মিস সুহাসিনী পলের শিথিল চোখের তারা ধিকি ধিকি ক'রে জ্বলতে আরম্ভ করে।

মহিলা বলেন—তুমি সেদিন আমার ছেলের কাছ থেকে আট আনা ঠকিয়ে নিয়ে গিয়েছ। আমার ছেলে বোকা, কিন্তু আমি বোকা নই; চলে যাও এখান থেকে।

সুহাসিনী পল মুখ বিকৃত ক'রে বীভৎস ভাবে তাকায়। —তুমি বুঝি খুব চালাক?

হাতের বই বন্ধ ক'রে আর সেই বন্ধ বই-এর উপর চোখের চশমা নামিয়ে প্রৌঢ়া মহিলা বলেন—হ্যাঁ আমি জানি, তুমি জোচ্চুরি করে বেড়াও, তুমি মদ খাও।

সুহাসিনী পল তার ছেঁড়া গরমকোটের কলার খিমচে ধরে যেন একটা হিংস্র নিঃশ্বাসকে কোন মতে চাপতে চাপতে চেঁচিয়ে ওঠে—তুমি দেখেছ?

মহিলা বলেন—আমার চাকর দেখেছে।

সুহাসিনী পল বলে—চাকরকে এত বিশ্বাস না ক'রে ভগবানকে বিশ্বাস করতে চেষ্টা কর। তোমার অনেক বয়স হয়েছে।

মহিলা উঠে এসেই সুহাসিনী পলের একটা হাত চেপে ধরেন। তারপর আস্তে একটা টান দিয়ে, সুহাসিনী পলের থমকানো মূর্তিটাকে যেন উপড়ে নিয়ে গেটের দিকে চলে যেতে থাকেন মহিলা। মহিলার হাতের টানের সঙ্গে সামাল দিতে গিয়ে নড়বড়ে জুতো জোরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলতে থাকে সুহাসিনী পল। গেটের কাছেই এসে হুংকার ছাড়ে সুহাসিনী পল—তুমি আট আনা পয়সার জন্য আমাকে অপমান করলে, আমি অভিশাপ দিয়ে তোমার আট হাজার টাকা শেষ ক'রে দিতে পারি।

—তোমার কপাল! মহিলা গেটের দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

শিউরে উঠে একটা চিৎকার করতে গিয়েই চুপ হয়ে যায় সুহাসিনী পল। দুই শিথিল চক্ষুর ধিকি ধিকি জ্বালা নিয়ে বাড়িটার সুখী চেহারার দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে। ডাকাতের মত লোভ নিয়ে কি যেন প্রতিজ্ঞা করছে সুহাসিনী পলের চতুর প্রবঞ্চক ধূর্ত ও মিথ্যাবাদী জীবনের একটা সাহস।

বোধ হয়, সত্যিই আজ বিশ্বাস করেছে সুহাসিনী পল, একটা অভিশাপ দিয়ে এই বাড়ির আট হাজার টাকা বের ক'রে আনা যায়। এই বাড়ির বোকা ইন্সংম্যানের ঐ ভয়ানক চালাক মা-এর সব অহংকারকে কাঁদিয়ে জব্দ ক'রে দিতে পারা যায়, এমন অভিশাপ কি হয় না?

দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত তালতলার গলির দত্তবাবুর এই বাড়ির গেটের কাছেই পথের উপর একটা জীর্ণ অসহায় অথচ ভয়ংকর ক্ষুব্ধ অভিসন্ধির মত ঘোরাফেরা করতে থাকে সুহাসিনী পলের ভিক্ষুক মূর্তিটা। ঐ চালাক মায়ের বোকা ছেলেকে একবার কাছে পেলে হয়। তারপর সুহাসিনী পল তার অভিশাপের অস্ত্র ছাড়বে। তারপর বোকা ছেলের হাত থেকে কয়েক হাজার টাকা আদায় না করা পর্যন্ত রেহাই দেবে না সুহাসিনী পল।

মাধব দত্ত ইয়ংম্যান, জার্মানী থেকে ফিরে কলকাতার এক কারখানায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করে। বাপ বেঁচে নেই, মা-এর একমাত্র ছেলে। ছেলের শ্রদ্ধায় আর ছেলের রোজগারের টাকায় সত্যিই সুখী হয়ে আছে মাধব দত্তের মা-এর মন। শুধু সুখে নয়, শান্তিতেও আছেন মাধব দত্তের মা। এবং রোজ দুপুরে চশমা পরে গীতা পাঠ ক'রে ক'রে আরও শান্তি লাভ করেন।

বাড়ি ফিরছে মাধব দত্ত, সেই ইয়ংম্যান। সেই মুহূর্তে দু'চোখ জলে ভাসিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটে আসে সুহাসিনী পল। মাই বয়! মাই বয়!

বাড়ির গেটের দিকে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায় মাধব। আশ্চর্য হয়।

সুহাসিনী পল মাধব দত্তের মুখের দিকে করুণ ভাবে তাকিয়ে ফোঁপাতে থাকে।—ভেবেছিলাম তোমাকে কোন দিন বলবো না। কিন্তু আর না বলে থাকতে পারছি না।

মাধব—কি বলতে চান?

সুহাসিনী পল—তুমি নিশ্চয়ই জান না, কেন আবার আমি তোমার বাড়িতে এসেছিলাম।

মাধব—জানি বৈকি, টাকা চাইতে এসেছিলেন।

সুহাসিনী পল—নো মাই বয়, আমি তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।

মাধব—কেন?

সুহাসিনী পল—তুমি যে আমারই ছেলে।

মাধব ভ্রূকুটি করে—তার মানে? আপনি তো মিস সুহাসিনী পল।

সুহাসিনী পল—সেই জন্যই তো তোমাকে পরের কাছে ছেড়ে দিয়ে সারা জীবন আমার বুক উপোসী হয়ে কাঁদছে। সে যে আমার জীবনের প্রায় ত্রিশ বছর আগে একটা ভুল ভালবাসার লজ্জা। সম্মানের ভয়ে আমার সন্তানকে চুপে চুপে অরফ্যানেজে পাঠিয়ে দিতে হয়েছিল।

মাধবের বুক থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে। বিস্ময়ের শিহরটা যেন শরীরের রক্তের ভিতরেই ছুটাছুটি করছে। মাধব বলে—আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

সুহাসিনী পল বলে—জানি তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। কিন্তু যদি কোন দিন বিশ্বাস হয় তবে…।

আর কোন কথা না ব'লে চোখ মোছে সুহাসিনী পল, চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। মাধব একটা দশ টাকার নোট পকেট থেকে বের করে বলে—এই নিন, কিন্তু ঐসব বাজে কথা আর কখনো বলবেন না।

দপ্ ক'রে যেন হেসে ওঠে সুহাসিনী পলের শিথিল চক্ষুর অলস তারা দুটো।—দশ টাকায় আমার কি হবে? এতদিন পরে নিজের ছেলের কাছ থেকে হাত তুলে টাকাই যদি নেব তবে দশ টাকা নেব কেন? না, নেব না, চাই না টাকা।

বলতে বলতে চলে যায় সুহাসিনী পল।

মাধব হাসে, মাধবের কথা শুনে মাধবের মা'ও হাসতে থাকেন।

মাধবের মা বলেন—ভিক্ষুক বুড়িটা যে কত বড় ঠগ তা'তো তুই জানিস না, তাই সেদিন আট আনা পয়সা দিয়ে দিলি, আর আজও আবার দশটা টাকা দিতে গিয়েছিলি। দয়া করতে হয় ঠিকই, কিন্তু অপাত্রে দয়া করতে নেই।

মাধব হাসে—সে-কথা ভেবে হাসছি না। আমার ভাবতে হাসি পাচ্ছে, কি অদ্ভুত একটা মিথ্যে গল্প অনায়াসে কেঁদে কেঁদে বলে চলে গেল ঠগী বুড়িটা।

মাধবের মা গম্ভীর হন।—তুই যে কত বড় বোকা, তার প্রমাণ এই যে, তুই জোচ্চোর বুড়িটার মিথ্যা গল্পটাকে বার বার ভাবছিস।

মাধব তবু ভাবে—তাইতো ভাবছি, এই রকম একটা মিথ্যা গল্প বলবার কি দরকারই বা ছিল ওর?

মাধবের মা-এর চোখের চশমার কাচে ছোট একটা আতঙ্কের ছায়া যেন কেঁপে ওঠে। বোকা ছেলের মনের মধ্যে সত্যই সন্দেহ জাগলো নাকি, কে ওর মা? গীতা বন্ধ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠেন মাধবের মা—তোমার মত বোকার কাছ থেকে টাকা আদায় করা দরকার, তাই ঐ অদ্ভুত গল্প ফেঁদে তোমার মত বোকার মন ভোলাতে চায়। এটুকু বুঝতে এত দেরি হয় কেন?

আক্ষেপ করেন মাধবের মা—মানুষের জন্মের ঠিকানাই ভুল করিয়ে দিতে চায়, এ কি ভয়ংকর বুড়ি রে বাবা!

গীতার পাতা খোলবার আগে প্রতিজ্ঞা করেন মাধবের মা—আবার যদি বুড়িটা আসে তবে আমি পুলিশ ডেকে ওকে ধরিয়ে দেব।

কিন্তু ঐ প্রতিজ্ঞার পর প্রায় একটা মাস পার হয়ে গেল, মিস সুহাসিনী পল তালতলার দিকে আর আসে নি। নিশ্চিন্ত হয়েছেন মাধবের মা। কিন্তু মাধব মাঝে মাঝে ভাবে, আর আসে না কেন বুড়িটা? টাকা বাগাবার লোভে যখন এত বড় একটা অদ্ভুত গল্প তৈরি ক'রে আর বলে দিয়ে চলে গেল, তখন টাকা বাগাবার জন্য চেষ্টা করতে আর আসে না কেন? কিংবা মরেই গেল? থাকে কোথায় বুড়িটা?

ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলে আর লজ্জাও পায় মাধব। কিন্তু কি আশ্চর্য, তবু আর একবার দেখতে ইচ্ছা করে বুড়িকে। বুড়ির গল্পটা যেন মাধবের শরীরের রক্তের মধ্যে গোপন কৌতুকের মত সিরসির করছে। সেই ভুয়ো গল্পটা যেন ঠাট্টা ক'রে বলছে, আহা, এখন এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরে কোন্ অলিগলির ভিতরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে মাধবের সত্যিকারের মা, বেচারা ঐ সুহাসিনী পল!

সুহাসিনী পলকে সত্যিই খুঁজতে বের হয়নি মাধব। কিন্তু এণ্টালি বাজারের কাছে পথের উপর হঠাৎ এক সন্ধ্যায় সুহাসিনী পলকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলো মাধব। তারপর কাছে এগিয়ে গিয়েই হেসে ফেললো —কেমন আছেন আপনি?

সুহাসিনী পল হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে চমকে ওঠে।—তুমি? তুমি কোথা থেকে এলে, মাই বয়?

মাধব—বেড়াতে বের হয়েছি। কিন্তু আপনি আমাদের ওদিকে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলেন কেন?

সুহাসিনী পল—তোমার মা আমাকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেবে বলেছে। তাই আর যেতে সাহস পাই না।

মাধব—কে বলেছে এই কথা?

সুহাসিনী পল—তোমাদের চাকর।

মুখের হাসি রুমাল দিয়ে চেপে মাধব বলে—কিন্তু পুলিশের ভয়ে আপনি আপনার ছেলের কাছে যাবেন না, এ কেমন কথা?

অবাক হয়ে, দুই চোখ অপলক ক'রে মাধবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে সুহাসিনী পল। শিথিল চক্ষুর অলস তারা দুটো যেন অদ্ভুত এক

বিস্ময়ে স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছে। গলার স্বরটা অদ্ভুতভাবে কাঁপতে থাকে, আস্তে আস্তে বলে সুহাসিনী পল—গুড গড! তুমি কি সত্যিই আমার গল্পটা বিশ্বাস করেছ মাই বয়?

মনের হাসি মনের ভিতরে চেপে মাধব বলে—নিশ্চয় বিশ্বাস করি।

ঝিক ঝিক করে সুহাসিনী পলের ঘোলাটে চোখের তারা। যেন ঝিক ঝিক করছে এক ভিক্ষুক বুড়ির ধূর্ত মনের মতলব। বুঝতে পারে মাধব, বুড়ির মনের হতাশ অভিসন্ধিটা আবার আশার আলো দেখতে পেয়ে টাকা বাগাবার লোভেতে আর খুশিতে চমকে উঠেছে।

সুহাসিনী পল বলে—তাহ'লে···তাহ'লে আমি এখন করি কি?

মাধব—কি করতে চান?

সুহাসিনী পল—তুমি শুধু এক মিনিট দাঁড়িয়ে থাক মাই বয়, আমি এখনি আসছি।

ঝোলা হাতড়ে পয়সা বার করে সুহাসিনী পল। জুতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ছুটে গিয়ে সামনের দোকান থেকে ছু'টি মোড়ক হাতে নিয়ে ফিরে আসে।

মাধব—এগুলি কি কিনলেন?

সুহাসিনী পল—চা আর চিনি। তোমাকে একটু চা খাওয়াতে চাই। একটু কষ্ট. কর মাই বয়। বেশি দূর নয়, ঐ পানের দোকানের পিছনে গলির ভিতরে একটি বাড়িতে আমার একটি কেবিন আছে, সেখানে আমি থাকি। আমার সঙ্গে এস।

জুতো হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আর খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে যেতে থাকে বুড়ি সুহাসিনী পল। অদ্ভুত মজার আর মিথ্যার একটা নির্লজ্জ গল্প যেন খুঁড়িয়ে হাঁপিয়ে আর মরিয়া হয়ে এগিয়ে চলেছে। যেন বুড়ির এই ধূর্ত অভিনয়ের চরমটুকু দেখবার জন্য মাধবের মনটাও একটা কঠিন লোভের টানে পিছু পিছু চলতে থাকে।

মিস সুহাসিনী পলের কেবিন যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনই একটি কেবিন। পুরনো একটা দোতলা বাড়ির সিঁড়ির বাঁকের পাশে এক টুকরো অন্ধকার চট দিয়ে ঘেরা। চট সরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকে কেরোসিনের বাতি জ্বালে সুহাসিনী পল। শূন্য একটা প্যাকিং বাক্সের দিকে তাকিয়ে সুহাসিনী পল বলে, বসো মাই বয়।

কেটলি হাতে নিয়ে গরম জল আনতে চলে গেল সুহাসিনী পল। কোথায় গেল কে জানে! মাধব একবার পকেটে হাত দিয়ে দেখে, কিছু টাকা আছে কি না? যাবার সময় বুড়ি তো হাত পেতে বেশ মোটা রকম টাকা চেয়ে বসবে। কিছু তো দিতেই হবে নিশ্চয়। সেদিন দশ টাকার নোটও নিতে রাজি হয়নি বুড়ি, আজ যে দশ টাকার চেয়ে অনেক বেশি আশা ক'রে এই চা খাওয়াবার ফাঁদ পেতেছে। পঁচিশ টাকা আছে পকেটে। কে জানে পঁচিশ টাকায় খুশি হবে কিনা বুড়ি। বুড়ির সঙ্গে একটা তামাসা করবার লোভে এই ছন্নছাড়া অন্ধকারের বিবরের মধ্যে না এলেই ভাল ছিল।

গরম জল কেটলিতে ভরে নিয়ে ফিরে আসে সুহাসিনী পল। চা তৈরি করে। ঝোলার ভিতর থেকে পাঁউরুটি বের করে; তারপর ছুরি দিয়ে ছোট ছোট স্লাইস কাটতে থাকে। ঘরের কোণে রয়েছে অনেকগুলি শিশির স্তূপ। তার ভিতর থেকে একটা শিশি বের ক'রে নিয়ে এসে চামচ দিয়ে চেঁছে চেঁছে জেলি বার করে সুহাসিনী পল!—খেতে খুব খারাপ লাগবে না মাই বয়।

ঝোলার ভিতর থেকে হাতড়ে হাতড়ে একটা কলা বের করে সুহাসিনী পল।—আগে কলা দিয়ে রুটি খেয়ে নাও, তারপর জেলি খেও।

বেশ ভাল অভিনয় করছে সুহাসিনী পল। কোন খুঁত নেই। জীর্ণ-শীর্ণ দুটি হাত নেড়ে চেড়ে যেন দু'হাতের যত উপোষী স্নেহ ঢেলে দিয়ে ভাঙ্গা ডিসের উপর খাবার সাজায় সুহাসিনী পল। তারপর ডিসটা মাধবের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলে—খাও।

আপত্তি করে না, ঘেন্না ক'রে ঠেলে সরিয়ে দেবার সাহসও হয় না, চুপ ক'রে আনমনার মত উদাস চোখ নিয়ে খাবার খেতে থাকে মাধব।

গরম চায়ে চুমুক দিতেই মাধবের চোখ দুটো যেন একটা কুয়াশার ধাঁধার মধ্যে পড়ে ছটফট ক'রে ওঠে। চোখ দুটো হঠাৎ ঝাপসা হয়ে উঠেছে, তাই বোধ হয় কেরোসিনের বাতির টিমটিমে আলোটা একেবারে ঝাপসা দেখায়। অস্বস্তি বোধ করে মাধব। হাঁসফাঁস করে বুকের ভিতরে একটা ভয়াতুর নিঃশ্বাস। চা-এর কাপ হাতে নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে মাধব।

কি ভয়ংকর সুহাসিনী পলের এই কেবিন। চট জড়ানো বিছানায় একটা নোংরা স্তূপ, তোবড়ানো একটা টিনের বাক্স, আর একরাশ ছেঁড়া-ছেঁড়া জামা কাপড়; ঘরের জিনিসগুলো যেন আবছা অন্ধকার জড়িয়ে পিণ্ড

পিণ্ড মাংস আর নাড়ির মত মাধবের দেহের চারদিকে বেদনাভরা এক জন্মলোকের জঠর রচনা ক'রে রেখেছে। সত্যিই ভয় পায় মাধব, সুহাসিনা পলের এই কেবিনের গর্ভে যেন একটা শিশু-প্রাণের মত ধুকপুক করছে মাধবের ত্রিশ বছর বয়সের প্রাণ।

নাঃ, এখানে আসাই উচিত হয়নি। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে উঠে দাঁড়ায় মাধব। ব্যস্তভাবে, সিঁড়িতলার এই খুপরির গুমোট থেকে বের হয়ে বাইরে এসে গলির উপর দাঁড়ায়। সুহাসিনী পলও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে কাছে দাঁড়ায়। মাথা দুলিয়ে মাধবের মুখের দিকে আবার কিছুক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে তারপর হাসতে থাকে সুহাসিনী পল। যেন আহ্লাদে মাধবের গায়ের উপর ঢলে পড়তে চায় বুড়ি।

চমকে পিছনে দু'পা সরে যায় মাধব। মাধবের মাথাটা ধরবার জন্য হাত তুলেছে কেন বুড়ি! সত্যিই চুমো খাবে নাকি বুড়ি?

সুহাসিনী পল বলে—এই রকম ঠাণ্ডার রাতে এত পাতলা জামা গায়ে দিও না মাই বয়। প্রতি মাসে একবার ক'রে ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরামর্শ নেবে, রাত জেগে কাজ করবে না। সময় মত খাবে আর ঘুমোবে।

হেসে ফেলে মাধব। সুহাসিনী পল বলে—তুমি এত বেশি কাশছো ব'লেই বলছি। মনে হচ্ছে, তুমি ভয়ানক দুষ্টু ছেলে, সময় মত খাওয়া দাওয়া কর না।

মাধব বলে—আচ্ছা, আমি যাই এবার।

সুহাসিনী পল যেন নিজের মনের খুশিতে ধন্য হয়ে আর জীর্ণ-শীর্ণ চেহারাটাকে অদ্ভুত এক গর্বের গৌরবে শক্ত ক'রে দাঁড় করিয়ে মাধবের দিকে তাকায়। এক হাত তুলে বিদায়-দোলানি দুলিয়ে বলে—আচ্ছা, মাই বয়।

কিন্তু এখনও টাকা চাইছে না কেন বুড়ি? মাধব একটু আশ্চর্য হয়, এবং অপ্রস্তুতও হয়। কিন্তু সুহাসিনী পল সত্যিই তার সেই ভয়ানক কেবিনের দিকে চলে যাচ্ছে দেখে ব্যস্তভাবে ব'লে ফেলে মাধব—কিছু টাকা নিন।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ফিরে আসে সুহাসিনী পল। আস্তে আস্তে চোখ তুলে মাধবের মুখের দিকে তাকায়।—কিসের জন্য টাকা দিচ্ছ মাই বয়? চ্যারিটি?

মাধব—হ্যাঁ, কিছু টাকা আপনাকে দেওয়া উচিত।

সুহাসিনী পলের শিথিল চক্ষুর তারা দুটো আবার ধিকি ধিকি জ্বলতে আরম্ভ করে।—আমাকে বকশিস দিচ্ছ মাই বয়?

মাধব—হ্যাঁ, পঁচিশ টাকা।

সুহাসিনী পল—তবে কি তুমি সত্যিই আমার গল্পটা বিশ্বাস করনি?

মাধব—ওসব কথা ছাড়ুন, ওটা তো একটা গল্প।

সুহাসিনী পল—ও, তুমিও দেখছি চালাক মায়ের বেশ চালাক ছেলে!

লোভী শকুনের মত ছো মেরে মাধবের হাত থেকে নোটগুলি হাতে তুলে নিয়ে টলতে টলতে আর হাসতে হাসতে সেই অন্ধকারের বিবরে অদৃশ্য হয়ে যায় সুহাসিনী পল। মাধবও প্রায় এক দৌড় দিয়ে বড় রাস্তার আলোর কাছে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ে। —উঃ, আর একটু হলে মিথ্যুক বুড়িটা সত্যিই মা বলিয়ে ছাড়তো।

শেষ রাতের অন্ধকার যখন ফিকে হতে আরম্ভ করে, আর কদম গাছের মাথার উপরে একটা খড়-কুটোর নড়বড়ে বাসার ভিতরে ঘুমভাঙ্গা দাঁড়কাকের ডানা ফরফর করে, ঠিক সেই সময় লেভেল ক্রসিং-এর নিঝুম তন্দ্রাও যেন হঠাৎ ভেঙ্গে যায়। লেভেল ক্রসিং-এর চৌকিদার বুধন বার বার কাশে, গুমটির ভিতরে টুং টুং ক'রে একটানা স্বরে একটা ঘণ্টির মৃদু মুখরতা বাজতে থাকে। ঝন ঝন ক'রে দু'বার শব্দ হয়। লেভেল ক্রসিং-এর গেট বন্ধ ক'রে দেয় বুধন।

শেষ রাতের আকাশে চাঁদ থাকলে ঢাকুরিয়া লেকের বুকজোড়া কুয়াশার স্তূপও দেখতে পাওয়া যায়। আর দেখা যায়, ডায়মণ্ড হারবার থেকে ছুটে আসছে যে ট্রেনটা, তারই ইঞ্জিনের চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে, লাইনটা যেখানে একটু বেঁকে ডানদিকের নারকেলের সারির আড়ালে সরে গিয়েছে।

লাইনের পাশে পাশেই দ্রুত হেঁটে পথ চলতে থাকে ঢাকুরিয়ার প্রভাত রায়। কারখানার বাঁশি বাজবার আগেই তাকে কারখানার ফটকে পৌঁছে যেতে হবে। কাজেই বেশ একটু তাড়াতাড়ি, প্রায় হন্তদন্ত হয়েই ছুটতে হয়। কারখানাটাও তো নিকটে নয়। বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে সোজা হাঁটা দিয়ে যদি ঠিক ভোর পাঁচটার মধ্যে রসা রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াতে পারে প্রভাত, তবেই কারখানার বাসটাকে ধরতে পারা যায়। কলকাতার দক্ষিণ দিক থেকে কর্মী কুড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য কারখানার এই বাসটা ঠিক ভোর পাঁচটার সময় এই মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, পাঁচটা বেজে গেলে আর পাঁচ মিনিটও দেরি করে না। আর, ঠিক ছ'টার সময় হাওড়ার সেই কারখানায়, সেই একটা মেটাল ওয়ার্কশপের কলের বাঁশি বেজে ওঠে। কাজেই, যদি ফোরম্যান প্রভাত রায়ের কাজে আসতে দেরি হয়, তবে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে সব মেকানিক, কাজ চালু হতেই দেরি হয়ে যাবে, তাই এইভাবে শেষ রাতের আবছা অন্ধকারে প্রায় হন্তদন্ত হয়ে পথ চলতে থাকে প্রভাত রায়।

প্রত্যেক শেষ-রাতে যে শুধু আবছা অন্ধকার গায়ে মেখে পথ চলতে হয়, তা নয়। লেভেল ক্রসিং-এর পাশ কাটিয়ে আর একটু দূর এগিয়ে গেলে

লাইনের পাশে সেই কলমীদলে ঢাকা পুকুরটাকে দেখতে পাওয়া যায়। কোন কোন শেষ-রাতে চাঁদ থাকে আকাশে, পুকুরের বুকে আধ-ফোটা লাল শালুকের লাল রঙটুকুও চিনতে পারা যায়। জোনাকিগুলো কদম গাছের মাথার উপরে আর থাকে না। অন্ধকার খুঁজতে গিয়ে লাইনের পাশে এই আলোক-লতার ঝোপের ভিতরে ঢুকে ঝিকঝিক করে। ঐ সজনে গাছটার পায়ের কাছে একটা মাইল স্টোন। ছড়িয়ে পড়ে আছে হিমে ভেজা সজনের ফুল। একবার থামে প্রভাত, সিগারেট ধরায়, তার পরেই আবার পথ চলতে থাকে।

সেদিন সিগারেট ধরাতে গিয়েই চমকে উঠলো প্রভাত। শেষ রাতের চাঁদ তখনো ডুবে যায়নি, তাই দেশলাই না জ্বালিয়েও দেখতে পায় প্রভাত, মাইল স্টোনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটি মূর্তি।

—কে?

প্রভাতের আচমকা প্রশ্নে চমকে উঠেই সেই মূর্তি মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকায়। মূর্তির কানের দুলের পাথর ঝিক ক'রে চমকে ওঠে, শেষ রাতের জ্যোৎস্না যেন হঠাৎ ছোট একটা বিদ্যুৎ হয়ে ঝলসে উঠেছে সেই মূর্তির কানের কাছে। দু'পা পিছনে সরে গিয়ে আবার অন্যদিকে মুখ ঘোরায় সেই মূর্তি। মূর্তির পিঠের উপর ডবল বেণীর দোলা যেন একবার ছটফটিয়ে ওঠে, তারপরেই স্তব্ধ হয়ে যায়।

মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না, দেখতে পেলেও হয়তো স্পষ্ট কিছু বোঝা যাবে না, সে নারীর মুখের রূপ কেমন, এবং মুখের ভাবই বা কি রকম? কেন, কি উদ্দেশ্যে, কোন্ মতলবে, শেষ-রাতের এই স্তব্ধতার মধ্যে রেল-লাইনের পাশে এই নিভৃতে এসে দাঁড়িয়ে আছে গোপনচারিণী রহস্যময়ীর মত এই নারী?

হিমে ভেজা আর ধুলোমাখা সজনের ফুলের রাশের উপর লুটিয়ে পড়েছে তার শাড়ীর আঁচল। গলায় একটা কম্ফোর্টার জড়ানো, পায়ে স্যাণ্ডেল আছে। সন্দেহ করে, আশ্চর্য হয়, ভয়ও পায় প্রভাত।

ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন শব্দের শিহর তুলে ছুটে আসছে। কাঁপছে কঠিন লোহার লাইন। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চক্ষুর আলোক লাইনের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। নারীর মূর্তি ছটফট ক'রে ওঠে। তারপরেই, যেন অন্ধ মাতালের মত মত্ত হয়ে একটা ঝাঁপ দিয়ে লাইনের কাছে এগিয়ে আসে। লাইনের নুড়ি ছড়ানো পথের উপর উঠে ছুটতে থাকে সেই নারীর মূর্তি। তারের বাধায় পা জড়িয়ে যায়, ভাঙ্গা স্লিপারে হোঁচট লেগে পড়ে যায়, কিন্তু উঠেই আবার যেন মরিয়া হয়ে একরোখা পাগলের মত ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চক্ষুর

দিকে ছুটতে থাকে। ডবল বেণী ভেঙ্গে ছড়িয়ে যায়, আঁচল ছিঁড়ে যায়, গলার কম্ফোর্টার মরা সাপের মত ঝুলতে ও দুলতে থাকে, পায়ের একটা স্যাণ্ডেল খসে পড়ে যায়। ভ্রূক্ষেপ নেই, ভাবনা নেই, পিছু ফিরে তাকায় না, ছুটে যেতে থাকে একটা উদ্‌ভ্রান্তের মূর্তি।

আর এক মুহূর্তও দেরি করে না প্রভাত। অনেকবার হাফ-মাইল দৌড়ের খেলায় ফার্স্ট হবার অভিজ্ঞতা আছে ফোরম্যান প্রভাত রায়ের যে দুই পায়ে, সেই পা দু'টোও হঠাৎ মত্ত হয়ে ছুটতে থাকে। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চক্ষু তখন সেই অপরিচিতার ছায়ার একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। পিছন থেকে ছুটে এসে একটি লাফ দিয়ে অপরিচিতার চোখের সামনে দাঁড়ায় প্রভাত। পরমুহূর্তে, সেই অপরিচিতার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্তিকে দু'টি কঠিন বাহুর বন্ধনে বন্দী ক'রে বুকের উপর তুলে ধরে প্রভাত, এবং আর একটা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে লাইনের পাশে এসে দাঁড়ায়।

লাইনের পাশে ঠাণ্ডা মাটির নিরাপদ ধুলোর উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রভাত। যেন লেভেল ক্রসিংয়ের লোহার গেটের গরাদের মত কঠোর দু'টি হাতের বেড়া দিয়ে অতিকঠিন এক অবরোধ রচনা ক'রে রাখে প্রভাত। গোপনচারিণী সেই অপরিচিতার শরীর বৃথা ছটফট করে। ফোর-ম্যান প্রভাত রায়ের দুই হাতের কঠিন বন্ধন তবু বিন্দুমাত্রও শিথিল হয় না। নারীর একটি হাত শুধু হিংস্র হয়ে এলোমেলো আঘাত ছড়াতে থাকে, যেন এক নির্মম দস্যুর প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে একটা দুর্বল অসহায়তার আঘাত। প্রভাত রায়ের গলার টাই ছিঁড়ে যায়, চশমার একটি কাচ ভেঙ্গে যায়, কিন্তু বিচলিত হয় না প্রভাত রায়ের প্রতিজ্ঞা। ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেনের শেষ চাকাও শব্দের শেষ শিহর গড়িয়ে নিয়ে চলে যায়। আবার নীরব হয় শেষ রাতের শেষ প্রহর। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে নারী। ধীরে ধীরে তার সেই কঠিন বাহুর বন্ধন শিথিল ক'রে প্রভাত রায়ও হাঁপ ছাড়ে।

ঠাণ্ডা ধুলোর উপর দাঁড়িয়ে অপরিচিতার শরীর যেন আর একবার শিউরে ওঠে। চোখের উপর আঁচল চাপা দেয় নারী। দেখতে পায় প্রভাত, অপরিচিতার সেই করুণ মুখ যে সত্যই অতি সুন্দর একটি মুখ।

অপরিচিতা মুখ তুলে তাকায় না, এবং অপরিচিত এক পুরুষের এই সান্নিধ্যের বিরুদ্ধে আর সেরকম বিদ্রোহও ক'রে ওঠে না। যেন এতক্ষণে একেবারে অসহায় হয়ে গিয়েছে অপরিচিতার জীবনের অতি সাধের এক প্রতিজ্ঞা। কিন্তু চমকে ওঠে প্রভাত রায়েরই এতক্ষণের বিস্মিত ও বিব্রত

কৌতূহলগুলি। এই অপরিচিতা যে নিতান্তই অপরিচিতা নয়। এই মেয়ে তো সেই মেয়ে, প্রভাতেরই বোন হেনার বান্ধবী, কি যেন মেয়েটির নাম? প্রীতি, বাসুদেব সরকারের মেয়ে প্রীতি সরকার। কিন্তু সত্যই কি তাই? বিশ্বাস হয় না। এ নিশ্চয় প্রীতির মতই দেখতে আর একজন কেউ। নইলে, কি আশ্চর্য, প্রীতির মত মেয়ে কেন আসবে, এই শেষ রাতের শেষ প্রহরে, এই বিশ্রী নিভৃতে রেল লাইনের উপর পড়ে আত্মহত্যা করার জন্য? ঢাকুরিয়ার ঐ পাড়াতে সত্যই সুখের জীবন বলতে যদি কোন মেয়ের থেকে থাকে, তবে একমাত্র প্রীতি সরকারেরই আছে। দেখতে ভাল, লেখাপড়ায় ভাল, গানে-নাচেও বা কি কম যায়?

আর একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে প্রভাতের, এই তো ক'দিন আগে হেনাই খুশি হয়ে বলেছিল সেই কথা। প্রীতির বিয়েরও আর বেশি দিন বাকি নেই। সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে। পাত্র ঠিক আছে, বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে আছে। মনে পড়তে প্রভাতের মনের বিস্ময় আর একবার চমকে ওঠে। সত্যই রহস্য। বোঝা যায় না, কেন এবং কিসের জন্য, ঠিক যে সময়ে সংসারের এত সুন্দর একটা ইচ্ছা এসে প্রীতিকে আপন ক'রে নেবার জন্য তৈরি হলো, ঠিক সেই সময়ে প্রীতির জীবনে এমন কোন্ বেদনার অভিশাপ এসে লাগলো যে, জীবনটাকেই একটা অপমৃত্যুর পায়ের তলায় ফেলে চূর্ণ হয়ে যাবার জন্য এখানে ছুটে এসেছে প্রীতি?

—আপনাকে আমি চিনি, তার মানে চেনা-চেনা বলে মনে হচ্ছে। কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন ক'রে তাকিয়ে থাকে প্রভাত, কিন্তু চমকে ওঠে অপরিচিতার আঁচলধরা হাত। চোখের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে প্রভাতের মুখের দিকে সন্ত্রস্তের মত তাকায় অপরিচিতা। তারপরেই ক্ষুব্ধভাবে বলে —মিথ্যা কথা বলবেন না। চলে যান এখুনি।

প্রভাতও রূঢ়ভাবে বলে—চলে তো যাবই, কিন্তু যাবার আগে আপনার একটা গতি ক'রে দিয়ে যেতে হবে তো?

—কি বলছেন আপনি?

—বলছি, আপনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন, আমি বাধা দিয়েছি বলে সে-কাজ করতে পারেননি। পুলিশকে আর আপনার গার্জেনকে এ কথা জানাতে হবে।

—জানান গিয়ে।

—আপনাকেও যে সঙ্গে যেতে হবে।

—কখ্খনো না।

—তাহ'লে আমিও আপনাকে এভাবে এখানে রেখে এখন চলে যেতে পারি না।

পাগলের মত কিছুক্ষণ অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে থাকে, তারপর চিৎকার ক'রে ওঠে সেই ডবল বেণীর মেয়ে।—তাহ'লে আপনারই বিপদ হবে। পুলিশের কাছে আমি মিথ্যে কথা বলবো। বলবো, আপনি আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলেন।

হেসে ফেলে প্রভাত।—তা বলবেন, আপনার মিথ্যে কথায় যদি আমার বিপদ হয় তো হবে!

সঙ্গে সঙ্গে, যেন অসহায় শিশুর মত হঠাৎ ভয় পেয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠে অপরিচিতা।—আপনি না বুঝে-সুঝে মিথ্যে কেন দয়া দেখাচ্ছেন? যদি আমার ভাল চান তবে আমাকে এখানে থাকতে দিন, আর আপনি চলে যান।

কদম গাছের মাথার উপর কাকের কলরব জেগে উঠেছে। অনেক ফিকে হয়ে এসেছে শেষ রাতের আবছায়াময় রূপ। অপরিচিতার সেই জলভরা চোখের করুণতা বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এ যে সত্যই প্রীতি সরকার।

প্রভাত বলে—আমি ঠিকই চিনেছি, আপনি প্রীতি সরকার।

প্রীতি সরকার আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকতে গিয়ে প্রভাতের মুখের দিকে চকিতে একবার তাকায়। ভীতভাবে প্রশ্নও করে—কিন্তু আপনাকে তো আমি চিনি না।

প্রভাত—আমাকে না চিনলেও পরিচয় বললে আমাকে চিনতে পারবেন। আমি হেনার দাদা প্রভাত।

আঁচলে মুখ ঢাকা দিয়ে আর একবার নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি সরকার। কান্না চাপতে চেষ্টা করে প্রীতি, তাই কতগুলি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা নিঃশ্বাসের বেদনা শুধু আঁচলের চাপার আড়ালে ফোঁপাতে থাকে। দেখে মনে হয়, প্রীতি সরকারের জীবনের বিদ্রোহ হঠাৎ এভাবে একজনের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জিত হয়েছে। সে লজ্জা সহ্য করা যায় না, সে লজ্জার বেদনা নিষ্ঠুর বিদ্রূপেরই মত।

প্রভাত বলে—দুঃখ করো না, লজ্জিত হবারও কিছু নেই প্রীতি। শুধু বিশ্বাস কর, তুমি ভয়ংকর একটা ভুল করতে চলেছিলে, ভাগ্য ভাল যে সে ভুল করবার সুযোগ তুমি পেলে না।

প্রীতি সরকার তেমনই আঁচলের চাপার আড়ালে চোখ-মুখ লুকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। আবার ফুঁপিয়ে ওঠে—আমার না মরে উপায় নেই।

প্রভাত বলে—ছিঃ, ওকথা বলতে নেই।

প্রীতি—বড় অপমান আর বড় জ্বালা প্রভাতবাবু, আপনি মেয়ে হলে বুঝতেন, এই অপমান আর জ্বালা কত দুঃসহ।

প্রভাত—যতই দুঃসহ হোক, সে অপমান আর জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তুমি তোমার নিজের প্রাণটাকে খুন করতে পার না। সে অধিকার তোমার নেই।

প্রীতি—তার মানে?

প্রভাত—ধর, আমি যদি এই পথে আজ না আসতাম, আর তুমি যে ভয়ংকর কাণ্ড করতে চলেছিলে, সেটা যদি সত্যই হয়ে যেতো, তবে কতজনের জীবনে তুমি দুঃখ দিয়ে যেতে, সেটা বুঝে দেখ।

প্রীতি—আমি মরলে কে দুঃখ পাবে?

প্রভাত—এটা আবার কেমন কথা ব'ললে প্রীতি? যারা তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে, তোমার বাবা মা ও আর যাঁরা আছেন, তাঁদের জীবনে কত বড় দুঃখের ব্যাপার হতো বলতো?

প্রীতি—কিন্তু একজনের জীবনে খুবই সুখের ব্যাপার হতো।

প্রভাত আশ্চর্য হয়।—তার মানে?

প্রীতি—তিনিও নিজের প্রাণের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসতেন। তিন বছর ধরে তাঁর মুখ থেকে এই কথাই শুনে এসেছি।

প্রভাতের কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন সমবেদনার ছোঁয়ায় একটু বিচলিত হয়।—তারপর কি ব্যাপার হলো? তিনি আজ কোথায়?

হেসে ওঠে প্রীতি—তিনি আছেন, বেশ ভালই আছেন, আজই মাঝরাতের এক শুভলগ্নে তিনি তাঁর জীবনের এক বাঞ্ছিতাকে বিয়ে করেছেন।

—এই ব্যাপার! তাই বল। এতক্ষণে সব রহস্যের অর্থ বুঝতে পেরে হাঁফ ছাড়ে প্রভাত। ছলছল করে প্রীতি সরকারের চোখ।

প্রীতি বলে—আপনি জানেন না, কিন্তু আপনার বোন হেনা জানে, আজকের রাতের এক শুভলগ্নে তার সঙ্গে আমারই বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়েছিল।

সমবেদনার ছায়া ভাসে প্রভাতের চোখে। —কিন্তু তিনি এরকম ব্যাপার করলেন কেন?

প্রীতি—ভগবান জানেন!

প্রভাত—তুমি কোন অন্যায় করেছিলে?

প্রীতি—আমার তো মনে পড়ে না, কোনদিন ভুলেও তার মনে কোন দুঃখ দিয়েছি। বরং, তিন বছর ধরে শুধু ভেবেছি, কবে তার জীবনের আপন হয়ে যেতে পারবো, কবে সে আমাকে তার কাছে ডাকবে!

প্রভাত বলে—দুঃখ করো না প্রীতি। বাড়ি যাও এখন, চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

কথা বলতে গিয়ে প্রভাতের গলার স্বর যেন আচমকা একটু কেঁপে উঠেই শান্ত হয়ে যায়। প্রভাতের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রীতিও যেন আচমকা একটু আশ্চর্য হয়ে যায়। প্রীতি বলে—আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে আপনি কেন দুঃখ করছেন প্রভাতবাবু? আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার জন্যে আপনাকেও অনেক ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হলো।

প্রভাত—তোমাকে উপদেশ দেবার অধিকার আমার নেই, তবু তুমি আমার একটা কথা শোন প্রীতি।

প্রীতি—বলুন।

প্রভাত—কথা দাও আমার কথা রাখবে?

প্রীতি—রাখবো।

প্রভাত—হয় এই দুঃখকে সহ্য কর, নয় ভুলে যেতে চেষ্টা কর। কিন্তু কোন দিন আর এই রকম ভয়ানক অন্যায় করতে চেষ্টা করবে না। পৃথিবীর কত মানুষ এর চেয়ে কত বেশি অপমান আর দুঃখ সহ্য ক'রেও বেঁচে থাকে, তোমাকেও বেঁচে থাকতে হবে।

প্রীতি—কিন্তু আমি যে তার কথা ভুলতে পারি না প্রভাতবাবু।

প্রভাত—ভুলতে বলছি না।

প্রীতি—তবে কি বলছেন?

প্রভাত—তাঁর ওপরে রাগ ক'রে তুমি আত্মহত্যা করতে পার না। তোমার জীবনের দাম এত তুচ্ছ নয়। একজনের ভালবাসা জীবনে পেলে না বলে তুমি আর পাঁচ জনের ভালবাসা তুচ্ছ করতে পার না।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি। কদম গাছের মাথায় পুব আকাশের আভা ছড়িয়ে পড়ে। ব্যস্ত হয়ে প্রভাত বলে—আমার অনেক দেরি হয়ে গেল প্রীতি, তুমি আর আমাকে ভুগিও না।

প্রীতি—আমি যাচ্ছি। আপনি আপনার কাজে যান।

চলেই যাচ্ছিল প্রীতি। প্রভাতই হঠাৎ বলে ওঠে।—তুমি কথা না দিয়ে যেতে পারবে না।

থমকে দাঁড়ায় প্রীতি। দেখে আবার আশ্চর্য হয়, একটা মানুষ ভোরের প্রথম আলোর মত তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে। নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। একটা মেয়ের অপমানের জীবনের সব দুঃসহ দুঃখকে বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়েছে। কথা চাইছে। প্রীতি সরকার সত্যই বেঁচে থাকবে, এই আশ্বাস না পেয়ে চলে যেতে পারছে না। মনে পড়ে প্রীতির, হেনারই মুখে শুনেছে হেনার দাদার কথা। কারখানার ফোরম্যান, লোহা-লক্কড় ঘাঁটে, কিন্তু মনটা বড় নরম। একটা অন্ধ হোঁচট খেয়ে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, তাই দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেছিল হেনার দাদা। এই প্রভাতবাবুই তো হেনার সেই দাদা।

প্রীতির নীরবতা দেখে আরো উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে প্রভাতের চোখের দৃষ্টি। প্রভাত বলে—আমিও কথা দিচ্ছি, আজকের ব্যাপার কেউ জানতে পারবে না। কারও কাছে আমি ভুলেও গল্প করবো না যে, তুমি আজ ট্রেনের চাকার তলায় প্রাণ দিতে এসেছিলে। আজকের ঘটনার জন্য তুমিও কোন লজ্জা বা দুঃখ বা রাগ মনে রেখ না। কিন্তু কথা দাও, আর কখনও এরকম কাণ্ড করতে আসবে না।

শান্তস্বরে, ধীরে ধীরে, প্রভাতের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে প্রীতি বলে—না, আর না. আর আমি এই ভুল করবো না প্রভাতবাবু, আপনি বিশ্বাস করুন।

প্রভাত—বিশ্বাস করলাম প্রীতি। চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ঢাকুরিয়া লেকের কুয়াশার উপর রোদের আভাস পড়েছে। তাল নারকেল আর সুপারির ছায়ায় ঘেরা এক একটা ঘুমন্ত পাড়ার প্রাণও এতক্ষণে সাড়া দিয়ে জেগে উঠেছে। আর একটা ট্রেন আসছে। তীব্র স্বরে বাষ্পের বাঁশি বাজিয়ে ছুটে চলে গেল ভোরের প্রথম প্যাসেঞ্জার। রেল লাইনের পাশের সরু পথ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে যেতে থাকে প্রীতি সরকার। সঙ্গে প্রভাত রায়।

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়ায় প্রীতি —এইবার আপনি আপনার কাজে চলে যান প্রভাত-বাবু।

প্রভাত—চল, তোমাকে বাড়ি পর্যন্তই এগিয়ে দিয়ে আসি।

চমকে ওঠে, ভয় পায় প্রীতি। —আঃ, আপনি বোঝেন না কেন? আপনি কি আমাকে আর একটা বিপদে ফেলতে চান?

প্রভাত বিস্মিত হয়। —বিপদ?

প্রীতি—এই ভোরে আমাকে এভাবে আপনার সঙ্গে যেতে দেখলে মানুষগুলি কি মনে করবে বুঝতে পারছেন না কেন?

ভয় পায় প্রভাত। —মনে করবে? কি মনে করবে?

প্রীতি—ঐ দেখুন, কারা যেন আসছে। দোহাই আপনার, পায়ে পড়ি আপনার, আপনি এখুনি চলে যান প্রভাত বাবু।

প্রভাত—আমি না হয় চলে গেলাম, কিন্তু তোমাকে তো ওরা দেখে ফেলবে।

প্রীতি—একা আমাকে দেখে ফেলুক, আমি মিথ্যে কথা বলবো, ওরা তাই বিশ্বাসও করবে। কিন্তু আপনি সঙ্গে থাকলে আমার কোন মিথ্যে কথাই ওরা বিশ্বাস করবে না।

হতভম্বের মত তাকিয়ে প্রীতির এই অদ্ভুত প্রলাপের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে প্রভাত। প্রীতি বলে—যান, যান, যান। আর একটুও দেরি করবেন না। আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আমার মান বাঁচান।

একটা লাফ দিয়ে আতঙ্কিতের মত সরে যায় প্রভাত। তারপর হন হন ক'রে রেল লাইনের পাশে পাশে সরু পথ ধরে প্রায় ছুটে চলে যেতে থাকে।

এলোমেলো শাড়ির আঁচলটাকে ভাল ক'রে গায়ে জড়ায় প্রীতি। ডবল বেণীর এলোমেলো আর ভাঙ্গা বাঁধুনি ভাল ক'রে ভেঙ্গে দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা খোঁপা বেঁধে ফেলে। তারপর আরও তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলতে থাকে।

বাড়ির বারান্দার উপর এসে উঠে যখন হাঁপ ছাড়ে প্রীতি, তখন বারান্দার সিঁড়িতে পুব আকাশের আলো এসে পড়েছে। জেগে উঠে বসে আছেন প্রীতির বাবা বাসুদেব সরকার। ক্লান্ত শরীরকে একটা চেয়ারের উপরে এলিয়ে দিয়ে প্রীতি বসে পড়তেই প্রশ্ন করেন বাসুদেববাবু। —এত ভোরে কোথায় গিয়েছিলি রে?

প্রীতি হাসে—রেল লাইনের ধারে একটু বেড়িয়ে এলাম।

খবরের কাগজের আশায় পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন বাসুদেববাবু, এখনও কাগজের কোন হকারের সাড়া জাগেনি পথের উপর। আর, গলার

কম্ফোর্টার খুলে ফেলতেই দেখতে পায় প্রীতি, কয়েকটা ফুল ঝ'রে পড়লো বারান্দার উপর। আশ্চর্য, কম্ফোর্টারের ভাঁজে এতগুলি ফুল কেমন ক'রে এতক্ষণ ধরে লুকিয়েছিল?

বাসুদেববাবু বলেন—ওগুলি কিসের ফুল রে প্রীতি?

প্রীতি হাসে। —সজনে ফুল।

খবরের কাগজের হকার এসে বারান্দার ওঠে। খবরের কাগজের পাতার দিকে তাকিয়ে থাকেন বাসুদেববাবু। আর, প্রীতি তাকিয়ে থাকে সেই তুচ্ছ কয়েকটা সজনে ফুলের দিকে। শেষ রাতের শেষ প্রহরের একটা অদ্ভুত ঘটনার উপহারের মত কয়েকটা সাদা ফুল।

প্রীতির চোখ দুটো হঠাৎ ছটফট ক'রে ওঠে। বাসুদেববাবুর দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে নেয় প্রীতি। তার পরেই ফুলগুলিকে মেজের উপর থেকে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতর চলে যায়।

হেনার দাদার কাছে কথা দিলেই বা কি আসে যায়? ভালবাসার অপমান ভুলতে পারে না প্রীতি, সহ্য করতেও পারে না। বার বার মনে পড়ে, একটি মানুষের হাসিভরা মুখের ছবি, যে মুখের কোন হাসি আর কোন ভাষাকে জীবনে অবিশ্বাস করেনি প্রীতি। কিন্তু কে জানতো, সেই সব হাসি আর ভাষা শুধু একটা অভিনয়? সেই মানুষই আজ পৃথিবীর কোন্ এক রূপের মেয়েকে বিয়ে ক'রে সুখী হয়ে রয়েছে। প্রীতি জানে সে খবর, বিয়ের পর জীবনসঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে রাঁচি বেড়াতে গিয়েছে অতীশ। সরকারী অফিসার অতীশের পদোন্নতিও হয়েছে। সে আজ ন'শো টাকা মাইনের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। অতীশের মা নিজেই পাঁচ পাড়া ঘুরে ঘরে ঘরে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, বড় লক্ষ্মী বউ তাঁর ঘরে এসেছে, আসা মাত্র ছেলের পদোন্নতি হয়েছে।

হ্যাঁ, কল্পনা করলে আরও অনেক কিছু বুঝতে পারে প্রীতি। অতীশ বসু নামে সেই ভদ্রলোকের সুখের এবং সাধেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। সে মানুষ বোধ হয় এখন নতুন স্বপ্ন চোখে নিয়ে আর জীবনসঙ্গিনীর হাত ধ'রে হুডরুর ঝরণার ধারে বসে জলের খেলা দেখছে।

ছিঃ, মানুষ শত্রুকেও এমন করে ঠকায় না। কিন্তু ভদ্রলোক অতীশ বসু এমন এক মেয়েকে ঠকিয়ে আর অপমান ক'রে সুখী হলো, যে-মেয়ে সারা জীবনের যত্ন দিয়ে অতীশকেই সুখী করবার জন্য তৈরি হয়েছিল। প্রীতির

ভালবাসার সব আশাকে বিনা দোষে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিল অতীশ। শুধু এই অপমানের স্মৃতি দিনরাত চুপ ক'রে সহ্য ক'রে লাভ কি? মৃত্যুই তো ভাল ছিল, কিন্তু কোথা থেকে আর এক অদ্ভুত আপদ এসে প্রীতিকে মরে বাঁচবার সুখটুকুও পেতে দিল না।

মনে পড়ে প্রীতির, হেনার দাদার চোখ দুটোও একবার ছল ছল ক'রে উঠেছিল। প্রীতির জীবনের দুঃখ ও অপমানের জ্বালা কত দুঃসহ, সেটুকু বুঝতে পেরেছিল সেই অপরিচিত মানুষটাও।

মনের যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকে প্রীতি। কোন ছল ছল চোখকে বিশ্বাস ক'রে লাভ নেই। হেনার দাদাও তো অতীশ বসুর জাত। ওর কথারই বা কি মূল্য আছে? ওর কাছে একটা কথার সম্মান রাখবার জন্য এইভাবে বেঁচে মরে থাকবার কোন অর্থ হয় না। হেনার দাদা বুঝবে কি ক'রে, যার ভালবাসার হৃদয় হঠাৎ শূন্য হয়ে যায়, তার পক্ষে বেঁচে থাকা কী ভয়ংকর শাস্তি?

সেদিন বেড়াতে এসেছিল হেনা। হেনাকে দেখে ভয়ানক একটা সন্দেহও চমকে উঠেছিল প্রীতির মনের ভিতরে। হেনার দাদা, সেই অদ্ভুত মানুষটা কি তবে হেনার কাছে হেসে হেসে বলে দিয়েছে সব কথা। প্রীতির জীবনের দুঃখ নিয়ে ঠাট্টা ক'রে, আর প্রীতির জীবনের সম্মান ও সুনাম নষ্ট ক'রে সুখী হয় এই মানুষটারও মন?

কিন্তু এই সন্দেহের জন্যই শেষে লজ্জা পায় প্রীতি। হেনার কথায় বোঝা যায়, কোন খবরই পায়নি হেনা। হেনা বরং হেসে হেসে বলে—বিয়ের দিন পিছিয়ে গেল নাকি প্রীতি? পাত্র বোধ হয় ছুটি পায়নি, তাই না?

প্রীতি বলে—তাই হবে বোধ হয়।

হেনা বলে—পাত্র এখন কোথায়?

প্রীতি—কাছেই ছিল, এখন দূরে চলে গিয়েছে।

হেনা—হেঁয়ালি ক'রে বলো না ভাই, সত্যি কথা বল।

প্রীতি হাসে—বিয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে।

হেনাও হাসে—ভদ্রলোকের জন্য দুঃখ হয়। ঠকেছেন ভদ্রলোক, ভুল ক'রে ভয়ানক ঠকলেন।

হেনা চলে যায় এবং প্রীতির মনটাও হঠাৎ শান্ত হয়ে যায়। তাহ'লে কথা রেখেছে হেনার দাদা, কাউকেই কিছু বলেনি। কিন্তু মনের এই শান্তিই যেন ধীরে ধীরে অস্বস্তি হয়ে মনের ভিতর হাঁসফাঁস করতে থাকে। হেনাকে

কি-যেন জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিল প্রীতি, কিন্তু ভুলেই গিয়েছে। কি বিশ্রী ভুল! এত উপদ্রব সহ্য করলেন যে ভদ্রলোক, প্রীতিকে মৃত্যুর পথ থেকে তুলে সরিয়ে নিয়ে গেলেন, আজ কেমন আছেন আর কি ভাবছেন সেই ভদ্রলোক? হেনার দাদা প্রভাতবাবু শেষ-রাতের আবছা অন্ধকার আর ফিকে জ্যোৎস্নার ভিতর দিয়ে প্রতিদিন কোথায় কতদূরে আর কি কাজ করতে যান, এই সামান্য একটা প্রশ্ন করলে এমন কি আর অশোভন ব্যাপার হতো?

প্রশ্ন না ক'রে ভালই হয়েছে। প্রশ্ন শুনে হেনা যদি হেসে ফেলতো আর জিজ্ঞাসা করতো, কোথায় কবে আর কেমন ক'রে আমার দাদার সঙ্গে তোমার দেখা হলো প্রীতি? তবে? তবে, হেনার সেই হাসিভরা সন্দেহের ভুল ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব হতো না। কোন কথাই বলা যেত না। ভুল ধারণা নিয়ে চলে যেত হেনা।

এক এক ক'রে কত শেষ রাতের শেষ প্রহর দেখা দেয় আর চলে যায়। রেল লাইনের লেভেল ক্রসিং-এর গুমটির ভিতর টুং টুং ক'রে ঘন্টির শব্দ বাজে আর জ্বলন্ত চক্ষু নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের ট্রেন ছুটে চলে যায়।

শেষ রাতের শেষ প্রহরে যেন স্বপ্নভরা ঘুম অকারণে ভেঙ্গে যায়, জেগে বসে থাকে প্রীতি। লোহার লাইন কাঁপিয়ে গুরু-গুরু শব্দের ঝংকার গড়িয়ে ছুটে চলে যায় ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন। প্রীতি সরকারের মনের ওপর যেন টুপ টাপ ক'রে ঝরে পড়তে থাকে শেষ রাতের হিমে ভেজা সজনে ফুল।

আর, অসহায়ের মত চুপ ক'রে বসে মনের ভিতরে একটা মধুর অনুভবের সঙ্গে যেন লড়াই ক'রে হাঁপাতে থাকে প্রীতি সরকার। ডাকাতের মত তাড়া ক'রে পিছন থেকে ছুটে এসে একটা উদ্বেগভরা আগ্রহ শক্ত ক'রে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো প্রীতিকে, আর বুকের উপর তুলে নিল। কী ভয়ংকর কঠিন সেই দু'টি হাতের বন্ধন! একটা অপরিচিতা মেয়েকে ওভাবে বুকের উপর তুলে নিতে একটুও কি লজ্জা লাগেনি মানুষটার বুকের পাঁজরে?

সেদিন না হয় উপকারই করেছিলেন ভদ্রলোক, কিন্তু উপকার করতে গিয়ে যে-সব কাণ্ড করলেন, সে-কথা ভাবতে গিয়ে আজও কি ভদ্রলোকের চিন্তা একটুও লজ্জিত হয় না?

মনে হয় প্রীতির, সে-রকম কোন চিন্তার বালাটই বোধ হয় নেই হেনার দাদার মনে। তা না হলে এই ছয় মাসের মধ্যে একবারও অন্তত খোঁজ নিতেন। নইলে নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে হতো, কেমন আছে সেই মেয়ে, যাকে তিনিই

শেষ রাতের শেষ প্রহরের এক সর্বনেশে নিশির ডাকের গ্রাস থেকে বাঁচালেন। সব মিথ্যে। মিথ্যেই ভদ্রলোকের চোখ দুটো ছল ছল করেছিল, মিথ্যেই এত উপদেশ দিলেন, মিথ্যেই কথা দিলেন আর কথা নিলেন। উপকারের, সহানুভূতির আর উদ্বেগের অভিনয় ক'রে সরে পড়লেন।

শেষ রাতের শেষ প্রহরের বিরুদ্ধে যেন একটা অভিমান গুমরে ওঠে প্রীতির মনের ভাবনায়। সেই মানুষটি তো এখন সেই রেল লাইনের পাশ দিয়ে সেই সরু পথ ধরে হেঁটে চলেছে। সেই সজনে গাছের বুক থেকে এই ঝড়ো বাতাসের ছোঁয়ায় এখনও বোধ হয় ফুল ঝরে পড়ে, যদি এখনও ফুল থেকে থাকে। কিন্তু সে কি আজও সেদিনের মত হঠাৎ সেখানে থামে? থামলেও কি মনে পড়ে, একটি মেয়ের জীবনের দুঃখ সেখানেই একদিন মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল?

মনে পড়ে না নিশ্চয়ই, মনে পড়লে এই সত্যও কল্পনা করতে পারতো সেই মানুষ, যে-মেয়েকে মৃত্যুর পথ থেকে সরিয়ে সংসারের দিকে আবার পাঠিয়ে দিলো সে, সে-মেয়ে তার জীবনের সকল ক্ষণের চিন্তায় তারই মূর্তিকে স্মরণ করে। ভুলতে চেষ্টা করলেও যে ভুলতে পারে না প্রীতি। রাগ হয়, ছুটে যেয়ে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করে। মিছামিছি একটা মেয়ের দুঃখের প্রাণকে বাঁচিয়ে দিয়ে আবার মিছামিছি এত তুচ্ছ করছে কেন হেনার দাদা? অন্ধ মানুষ হোঁচট খেয়ে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেলে যে-মানুষ ডুকরে কেঁদে ওঠে, সে-মানুষ কেন কল্পনা করতে পারে না, এভাবে একটি মেয়ের আশাকে তুচ্ছ করলে তাকে অপমানের কাদায় ডুবিয়ে দেওয়া হয়?

না, বড় দুঃসহ এই শূন্যতা। নতুন করে আবার এক অপমানের জ্বালার মধ্যে জীবনটাকে টেনে নিয়ে এসেছে প্রীতি। নিজেরই উপর মনের সব ঘৃণা শিউরে উঠতে থাকে। এক একটা হৃদয়হীন ছলনার কাছে ভুল লোভের ভুলে এগিয়ে গিয়েছে প্রীতির জীবন, তাই আড়াল থেকে অদৃষ্ট বোধ হয় বিদ্রূপ করেছে, আর লাভ হয়েছে শুধু অপমানের জ্বালা।

আমাকে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ হলো আপনার? সব লজ্জার মাথা খেয়ে বেহায়ার মত এই প্রশ্ন ক'রে হেনার দাদাকে একটি চিঠি দিতে পারা যায়। কিন্তু···ভাবতে গিয়ে অনেকক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে থাকে প্রীতি। মাঝ রাতের প্রহর পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ, ঢাকুরিয়ার নারকেলের পাতার ঝালর শেষ রাতের একটা টুকরো চাঁদের আলোকে ঝিকমিক করে, আর ফুরফুরে বাতাসে ঝিরঝির করে। খোলা জানালা দিয়ে নিস্তব্ধ পথের দিকে একবার

তাকায় প্রীতি। কোন লাভ নেই অমন একটা ভোলা মানুষকে চিঠি দিয়ে। যে-মানুষ মুখ দেখেও মানুষ চিনতে পারে না, সে-মানুষ চিঠি পড়ে আর কি বুঝবে ছাই।

ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন কি চলে গিয়েছে? ছটফট ক'রে ওঠে, জলভরা চোখের ঝাপসা দৃষ্টি তুলে ঘড়ির দিকে তাকায়। হ্যাঁ, শেষ রাতের শেষ প্রহর এসে গিয়েছে।

সত্যিই, যেন আবার এক নিশির ডাকের আহ্বান শুনেছে প্রীতি। ঘরের দরজা খুলে বারান্দার উপর এসে দাঁড়ায়। তারপরেই পথে নেমে পড়ে।

সজনে গাছে আবার নতুন ফুল ধরেছে। পুকুরের কলমীদলের ফাঁকে ফাঁকে জলের বুকে টুকরো চাঁদের আভা চিকচিক করে। চমকে ওঠে আর থমকে দাঁড়ায় প্রভাত।—এ কি, তুমি আবার এখানে কেন প্রীতি?

প্রীতি বলে—মিছামিছি চমকে উঠবেন না, ভয় পাবেন না, দুঃখও করবেন না, আমি মরতে আসিনি প্রভাতবাবু।

ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেন ছুটে আসতে থাকে। ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চোখ ফুটে উঠেছে ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে। সাবধান হয় প্রভাত। চশমা খুলে পকেটে রাখে। এই মেয়ের মুখের কথায় কোন বিশ্বাস নেই। প্রভাতের হাত দুটো এরই মধ্যে এক কঠিন আগ্রহে কঠিন হয়ে ওঠে। আবার বাধা দিতে হবে, পথ আটক ক'রে থামিয়ে রাখতে হবে, যেন নিজের প্রাণের সর্বনাশ করার কোন সুযোগ না পায় এই ছন্নছাড়া মনের মেয়ে।

ধিক্কার দেয় প্রভাত—ছিঃ, তুমি কথা দিয়েও কথার সম্মান রাখলে না।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রীতি।

প্রভাত বলে—তুমি আমার মনের একটা আনন্দকেও নষ্ট ক'রে দিলে।

প্রভাতের মুখের দিকে তাকায় না প্রীতি, কিন্তু প্রীতি যেন সারা অন্তর দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে প্রভাতের সব ধিক্কার আর অনুযোগের ভাষা।

প্রভাত বলে—প্রতিদিন এই পথে যেতে একবার তোমার কথাই ভেবেছি। শুধু মনে হয়েছে, এতদিনে শান্তি পেয়েছ তুমি, ভাল আছ তুমি। কিন্তু…।

লোহার লাইন কাঁপে আর ঝনঝন করে। ডায়মণ্ডহারবারের ট্রেনের ইঞ্জিনের জ্বলন্ত চোখ থেকে আলো ছড়িয়ে পড়ে প্রীতির মুখের উপর।

দেখতে পায় প্রভাত, জলভরা চোখ তুলে যেন অন্য এক জগতের সান্ত্বনার দিকে কি-যেন আশা ক'রে তাকিয়ে আছে প্রীতি।

কেঁপে ওঠে প্রীতির গলার স্বর। —আমাকে ক্ষমা করুন প্রভাতবাবু।

প্রভাত রায়ের সতর্ক দু'টি কঠিন হাত আবার চমকে ওঠে। এক লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে প্রভাত রায়, আর সেই মুহূর্তে ছন্নছাড়া মনের মেয়েকে কঠোর দু'টি বাহুর বন্ধনে বন্দিনী ক'রে জড়িয়ে ধরে রাখে, যতক্ষণ না ট্রেনের শেষ চাকার শব্দ গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে চলে যায়।

ধীর স্থির ও শান্ত, কোন মত্ততা আর চঞ্চলতা নেই, প্রীতি সরকার যেন শেষ রাতের শেষ প্রহরের একটি সান্ত্বনার বুকের উপর পড়ে একটি মধুর অনুভবের লজ্জাকে ইচ্ছা করেই বরণ করছে। অপ্রস্তুত হয়ে, এবং তার বড় বেশি দু'টি উদ্বিগ্ন হাতের অকারণ চাঞ্চল্যে লজ্জিত হয়ে দু'পা পিছিয়ে সরে আসে প্রভাত রায়।

প্রীতি বলে—এখন বিশ্বাস করলেন তো, আমি যে সত্যিই মরতে আসিনি।

প্রভাত—বিশ্বাস করছি। কিন্তু কেন এসেছ তুমি?

প্রীতি—আপনার কাছে একটি প্রশ্ন ছিল, যে প্রশ্ন চিঠিতে লিখে আপনাকে জানাবার সাহস পাইনি।

প্রভাত—বল, কিসের প্রশ্ন।

প্রীতি—সে প্রশ্ন না শুনেই আপনি সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়েছেন।

প্রভাত—তার মানে?

প্রীতি—আপনি মিছামিছি রোজই আমার কথা ভেবেছেন কেন প্রভাতবাবু?

হঠাৎ মাথা হেঁট করে প্রভাত রায়। চুপ ক'রে শুধু ঠাণ্ডা মাটির ধুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বলে—তোমার কথা রোজই ভেবেছি, তাতে সত্যিই কি আমার কোন ভুল হয়েছে প্রীতি?

প্রীতি বলে—না।

কদমগাছের মাথার উপর পুব আকাশের আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রীতি বলে—আমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিন প্রভাত বাবু।

—চল। প্রীতির পাশে পাশে হেঁটে সরুপথ ধরে চলতে থাকে প্রভাত। কিছুদূর এগিয়ে এসেই থমকে দাঁড়ায় প্রভাত। —আর বোধ হয় আমার এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।

প্রীতি বলে—কেন উচিত হবে না? চলুন।

বোধহয় মনের ভুলেই চলতে চলতে প্রীতির সঙ্গে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে প্রভাত। প্রীতিদের বাড়ির ফটক দেখা যায়। অপ্রস্তুতের মত আবার থমকে দাঁড়ায় প্রভাত। —এবার আমি যাই প্রীতি।

প্রীতি—কেন?

প্রভাত—পথের লোক দেখতে পেলে সন্দেহ করতে পারে।

প্রীতি—করুক না সন্দেহ। আমার সঙ্গে আসুন প্রভাতবাবু।

বিস্মিতভাবে তাকায় প্রভাত।—কোথায়?

প্রীতি হাসে—আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আসুন। সকলেই দেখুক, বাবাও নিজের চক্ষে দেখে নিন, আপনি আমার সঙ্গে এসেছেন।

অপলক চোখ তুলে প্রীতির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রভাত। রাতের শেষ প্রহরের একটা মায়া প্রভাতের পথ ভুলিয়ে দিয়ে কোথায় তাকে নিয়ে চলেছে।

প্রভাত বলে—সত্যই যেতে বলছো প্রীতি?

ঝাপসা চোখের কোণ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে, প্রভাতের মুখের দিকে তাকায় প্রীতি। আস্তে আস্তে ধরা গলায় বলে—এস।

ওটি একটি দুর্নামের বাড়ি। আষাঢ়ের শেষ দিকে যখন উশ্রীর বুকে ঘোলা জলের ঢল নামে, তখন এই বাড়িরই একটি জানালার ধারে দাঁড়ালে উশ্রীর সেই পাগলা চেহারা দেখা যায়।

ওটি একটি উচ্ছল খল-খল হাসির বাড়ি। হয় বাইরের ঘরে, নয় বারান্দায়, কিংবা সামনের এক টুকরো ঘেসো জমির উপর তিন-চারজন মানুষের জটলা সর্বক্ষণ মুখর হয়ে থাকে। সেই মুখরতার সঙ্গে মাঝে মাঝে উচ্চকিত হাসির হল্লা!

ওটি একটি অফুরান চা-এর বাড়ি। সর্বক্ষণ স্টোভ জলে, আর স্টোভের উপর ডেকচিতে জল ফোটে। পেয়ালা পিরিচের ঝনঝনানি সবসময়ই শোনা যায়। চাকর রামসেবক শুধু চা করবারই চাকর।

ওটি একটি গানের বাড়ি। যখন তখন হারমনিয়ম বাজে, কখনো বা এসরাজ। কখনো মেয়ে-গলার এবং কখনো বা পুরুষ-গলার গানে সুরেলা হয়ে ওঠে এই বাড়ির বাতাস।

ওটি একটি খেলার বাড়ি। ক্যারমের ঘুঁটির শব্দ ঠকাস্ ঠকাস্ করে ঘরের ভিতরে, এবং ঘরের বাইরে হ'লে ঘেসো জমির উপর ব্যাডমিণ্টনের লাফালাফি।

উশ্রীর কিনারায় পেঁপে গাছের ছায়ায় ঘেরা এই ছোট বাড়িটা যেন সর্বক্ষণের উল্লাস আর গুঞ্জনের এক মৌচাক। সেই উল্লাস আর সেই গুঞ্জনের মাঝখানে বসে আছে এই বাড়িরই মেয়ে। বিধু চৌধুরীর মেয়ে সুপ্রিয়া চৌধুরী।

মাসের মধ্যে বিধু চৌধুরী ক'টা দিনই বা বাড়িতে থাকেন? বড় জোর সাত-আটটা দিন। অভ্রের কেনা-বেচার কাজ করতে হ'লে শহর ছেড়ে দূরের যত খনির কাছে কাছে ঘোরা-ফেরা করতেই হয়। বিধু চৌধুরীও তাই করেন। জঙ্গলে ঘেরা এক একটি খান-অঞ্চলের ভিতরে ঢুকলে পাঁচ দিনের আগে কাজ সেরে ফিরে আসতেই পারেন না।

ফিরে আসলেই বা কি? বাড়ির এই সর্বক্ষণের উৎসবের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি বাধাও দেন না, বাহবাও করেন না। কর্মক্লান্ত জীবনটাকে শুধু দু'-তিনটি দিনের মত একটু চুপ ক'রে থাকা আর ঘুমিয়ে পড়ে থাকার আরাম পাইয়ে দিয়ে আবার বের হয়ে যান। তাঁর এই

একঘেয়ে খাটুনির পালা দু'চোখে দেখে যিনি সহ্য করতে পারতেন না, এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বাধা দিতেন, তিনি আর নেই। সুপ্রিয়ার মা মারা গিয়েছেন, সে-আজ দশ বছরেরও আগের কথা। বিধু চৌধুরীর এই সংসারের ক্ষুধা-তৃষ্ণার হিসাব রাখে আর সব কাজের দায় সহ্য ক'রে চাকর রামসেবকের মা।

এই বাড়িতে আর যারা থাকে তারা নেহাৎই ছেলেমানুষ। সুপ্রিয়ার দু'টি ভাই আর একটি বোন, যারা সময়মত স্কুলে যায় কি না যায় তা'ও কিছু বোঝা যায় না।

এই বাড়ি একটি অভাবেরও বাড়ি বটে, টাকা পয়সার অভাব। কিন্তু সে অভাব চোখে দেখে বুঝতে পারবে, এমন সাধ্য কার? যাঁরা বিধু চৌধুরীর কাজ-কারবারের খবর রাখেন, তাঁরাই শুধু জানেন যে, দেনার উপর দেনা ক'রে দিন পার ক'রে দিচ্ছেন বিধু চৌধুরী। মাসে একবার লাভ করলে তিনবার লোকসানে পড়েন বিধু চৌধুরী। কিন্তু তবু এই ক্যারম ব্যাডমিণ্টন হারমনিয়ম আর চা-এর নিত্য উৎসবে আত্মহারা হয়ে আছে বিধু চৌধুরীর বাড়ি।

তাই, তাই তো এই পাড়ায় আর ঐ পাড়ায়, এই মকতপুর ও বার-গণ্ডায় আর সেই দূর পচম্বাতে পর্যন্ত নানা জনের মুখে মুখে দুর্নামের গুঞ্জন ঘুরে বেড়ায়। তাই মেয়েটাকে একেবারে ওপেন জেনারেল লাইসেন্স দিয়ে দিয়েছেন বিধু চৌধুরী। টাকা পয়সা খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য নেই বিধু চৌধুরীর, এখন মেয়েটা যদি নিজের চেষ্টায় মনের মত একটা ছোকরাকে ধরে ফেলতে পারে।

লোকের চোখের সন্দেহকেও নিন্দা করা যায় না। বিয়ের বয়সের একটি সুন্দর মেয়ে, এবং তার চারদিক ঘিরে বিয়ের বয়সের গোটা তিন-চারেক ছেলেকে যদি প্রায় সব সময় ব্যস্ত আর উল্লসিত হয়ে থাকতে দেখা যায়, তবে সে-সন্দেহ হবেই বা না কেন? সুপ্রিয়ার জন্মদিনে সুপ্রিয়ার বান্ধবদের উপহারের সামগ্রীতে টেবিল ভরে যায়।

বিধু চৌধুরীর দুর্নাম হলো বিধু চৌধুরীর হতাশা ও অক্ষমতার দুর্নাম। টাকা-পয়সার অভাব আছে ব'লে কি মেয়েকে এইভাবে যথেচ্ছার সুযোগ দিতে হয়? কিন্তু সত্যিকারের দুর্নাম হলো বিধু চৌধুরীর মেয়ে সুপ্রিয়ারই দুর্নাম। সুপ্রিয়া যা করছে, তাকে এক কথায় বলা যায় পুরুষ নিয়ে খেলা।

সময়ে অসময়ে এক একটা সাইকেল ছুটে এসে গেটের কাছে থামে, তারপর ভিতরে চলে যায়। মাঝে মাঝে একটি বেবি অস্টিনও দেখা

যায়, পচম্বার সেই স্বর্গত রায় বাহাদুরের ছেলে বঙ্কিমের বেবি অস্টিন। ওদের সকলেরই জন্য এখানে সুপ্রিয়ার মুখের সমান মাপের হাসিভরা অভ্যর্থনা সবসময় তৈরি হয়েই রয়েছে।

এই পাড়া আর ঐ পাড়ার কত মেয়ে কত বাড়িতে বেড়াতে যায়, কিন্তু এই বাড়িতে কেউ আসে না। এমনকি সুপ্রিয়ার মাসতুতো বোন শৈলও এক বছর হলো এই বাড়িতে আসা ছেড়ে দিয়েছে।

অনেক সময় অনেকেরই মনের আশংকা চাপা-গলার আলোচনার মধ্যেই বেশ একটু উগ্র হয়ে ওঠে। ও মেয়ে বের হয়ে গেল বলে! ও মেয়ে হাসপাতালের মেটার্নিটি ওয়ার্ডে ভর্তি হলো বলে! প্রকৃতির প্রতিশোধ যে বেশিদিন চুপ ক'রে থাকে না মশাই!

সুপ্রিয়া চৌধুরীও কোন বাড়িতে বেড়াতে যায় না। সময় পেলে তো যাবে? তা' ছাড়া পাড়ার কোন বাড়ির মা-মাসিও পছন্দ করেন না যে, সুপ্রিয়া তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে আসুক। আসে না সুপ্রিয়া, অন্য বাড়ির কোন মেয়ের সঙ্গে এখন আর মেশেও না সুপ্রিয়া। অন্তত একটা ভয় থেকে কিছুটা রেহাই পায় অনেক বাড়ির মন।

একটা আশ্চর্যের ব্যাপার লক্ষ্য করতে হয়। সুপ্রিয়ার চোখের কাছাকাছি এসে ভিড় করে যেসব তরুণ মন আর যুবক চেহারা, তাদের সুনামের সৌরভে কখনও কোন নিন্দুকের সন্দেহ ও সমালোচনার জ্বালা লাগে নি। এদের সুনাম বিপন্ন হয়েছে, সন্দেহ আর অপবাদের বোঝা এদের মাথায় চেপেছে, শুধু এই অফুরান চায়ের আসরে এসে বসবার পর থেকে। সত্যি সত্যি, লোকের ধারণায় যেসব যুবকের মতিগতি সম্বন্ধে নিন্দা-ঘৃণা আছে তাদের কাউকে আজ পর্যন্ত সুপ্রিয়া চৌধুরীর হাসিমধুরসে উচ্ছল এই উল্লাসের মৌচাকের কাছে এসে গুঞ্জন করতে দেখা যায়নি, এবং শোনাও যায়নি। সত্যি সত্যি ভাল ছেলে বলে পরিচিত সুনামের মানুষগুলিই এখানে এসে ভিড় করে।

এইজন্যই তো সুপ্রিয়া চৌধুরীর নাম শুনলে ভয় পায় অনেক পরিবারের মন। ঠিক এই জন্যই তো সুপ্রিয়ার দুর্নাম বড় তীব্র হয়ে ওঠে। বিধু চৌধুরীর ঐ মেয়ে বেছে বেছে ঠিক ভাল ভাল মাথাগুলিকেই ডেকে এনে নষ্ট করে। যে পরিমল ফার্স্ট ক্লাস কোলিয়ারি ম্যানেজার হবে ব'লে রোজ সন্ধ্যাবেলা মাইনিং ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরিতে এসে বই পড়তো, সেই পরিমলকেই দেখা যায় রোজ সন্ধ্যাবেলা ঐ এক টুকরো ঘেসো জমির উপর সুপ্রিয়ার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছে।

কেমন ক'রে এই অসম্ভব সম্ভব হয়? অনেকেই বলে যে, মেয়েটাই অদ্ভুত এক মিষ্টি হাসির জাল ফেলে এক একটি ভাল ছেলের মন টেনে নিয়ে এসে ঐ অফুরান চায়ের ঝরনার মধ্যে ছেড়ে দেয়। পথে যেতে যেতে পরিমলদের মত কোন ভাল স্বভাব, ভাল চেহারা আর ভাল অবস্থার ছেলেকে দেখতে পেলেই হঠাৎ নাকি নিজে থেকেই যেচে আলাপ করে সুপ্রিয়া, তারপরেই চা-এর নেমন্তন্ন ক'রে ফেলে।

জিমনাসিয়ামের পরেশ আর নেপাল কিন্তু বলে—চা-এর নেমন্তন্ন করে না ঘেঁচু করে! বিধু চৌধুরীর মেয়ে রীতিমত অহংকারী, নিজের থেকে যেচে আলাপ করবার মত মেয়েই যে নয় সে। পরিমলেরাই নিজের থেকে যেচে সুপ্রিয়ার ভাই পণ্টুকে একটা বাজে কাজের ছুতো নিয়ে ডাকতে যায়। ভদ্রতা রক্ষা করবার জন্য সুপ্রিয়া ওদের চা খেতে বলে। বাস, তারপর আর কি? তারপর থেকে ওরা ওদের ক্যাংলা চোখের লোভ নিয়ে সুপ্রিয়া চৌধুরীর সুন্দর মুখের হাসি দেখবার জন্য রোজই চা খেতে আসে।

কে জানে কাদের কথা সত্যি! সুপ্রিয়া পথে যেতে যেতে কোন ভদ্রলোকের গায়ে পড়ে তাঁকে চা-এর নেমন্তন্ন করছে, এই দৃশ্য অবশ্য কখনও কারও চোখে পড়ে নি। আর পরিমলেরাই বা কেন যে পণ্টুর মত একটা ছোট ছেলেকে কোন বাজে কাজের ছুতো ক'রে ডাকতে যাবে, তা'ও কিছু বোঝা যায় না।

কিন্তু এটা তো খুবই স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় যে, সুপ্রিয়া তার হাস্যময় সুন্দর মুখের অভ্যর্থনা অবারিত ক'রে রেখেছে। সুপ্রিয়ার মনে কোন আপত্তি নেই, প্রতিবাদ নেই। এই সব বান্ধবদের কোন মুখরতাকে কখনো একটুখানি ভুরু কুঁচকেও শাসন করে না সুপ্রিয়া। যেন একদল মূর্তিমান স্তব সুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে হল্লা করছে, এবং সুপ্রিয়া তার মুখের সেই সুস্থির হাসির জ্যোতি নিয়ে মন্দিরেশ্বরী দেবিকার মত নীরবে সবই শুনছে।

একমাস বা দু'মাস, স্তবগুলি যেন ক্লান্ত হয়ে আসে। তারপরেই দেখা যায়, পরিমল আবার রোজ সন্ধ্যায় মাইনিং ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরিতে বই পড়ছে। বিধু চৌধুরীর বাড়ির এই অফুরান চা-এর ফোয়ারার চারদিকে তৃষ্ণার্ত পরিমলেরা আর কলরব করে না। কলরব করে অমিয়, অধীর আর শান্তিনাথ।

পরিমলদের বিপন্ন সুনামের বিপদ কেটে যায়। বরং সুনাম আরও বেশি

প্রশংসার গৌরব নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। সত্যি এরা বড় ভাল ছেলে, বড় শক্ত মনের ছেলে। বিধু চৌধুরীর ঐ মেয়ের চোখের লোভ আর মিষ্টি হাসির উদ্দেশ্য পরিমলদের কাউকেই শিকার করতে পারলো না। নিশ্চয় সুপ্রিয়া চৌধুরীকে হয় ভয় পেয়ে, নয় ঠাট্টা ক'রে ওরা সরে গিয়েছে। টাকা-পয়সা খরচ না ক'রে ভাল জামাই পেয়ে যাবেন, বিধু চৌধুরীর সেই ধূর্ত স্বপ্ন সফল আর হলো না। হবেও না বোধ হয়।

কিন্তু সুপ্রিয়া চৌধুরীর মতিগতি সম্বন্ধে সন্দেহগুলি এর পর একেবারে একটি কঠিন বিশ্বাসের হাওয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর সন্দেহ করবার কি দরকার? প্রমাণই তো পাওয়া যাচ্ছে, একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিজ্ঞতা। পরিমলেরাই আক্ষেপ করে আর বলতে গিয়ে লজ্জা পায়, সুপ্রিয়ার বাড়ির ঐ অফুরান চা-এর ফোয়ারার উদ্দেশ্য যে-মুহূর্তে ওরা টের পেয়েছে, সেই মুহূর্তেই ওরা পালিয়ে এসেছে। একেবারে কানের কাছে মুখ এগিয়ে দিয়ে সুপ্রিয়া স্বচ্ছন্দে যে-সব কথা বলে, সে-সব কথা শোনবার পর কোন ভদ্রলোকের পক্ষে আর ওখানে এক মিনিটও বসে থাকা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

সেদিন উশ্রীর বালিয়াড়ির উপর এক রক্তসন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে পুব আকাশের কোল থেকে পূর্ণচাঁদের ছায়া যখন ছড়িয়ে পড়লো, ঠিক তখনই বিধু চৌধুরীর বাড়ির বারান্দায় চা-এর আসরে অমিয়দের উল্লাস আর হাসি-হল্লার পাশেই একটি নতুন মুখের হাসি দেখতে পাওয়া গেল। কি আশ্চর্য, শেষে সুধাংশুর মত ছেলেও যে এসে ধরা দিল সুপ্রিয়া চৌধুরীর মিষ্টি হাসির কাছে।

পরিমলেরা আর অমিয়রা যদি আসে, এবং সুপ্রিয়া যদি ওদের ধ'রে আনবার চেষ্টা করে, তবে তার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট ক'রেই বোঝা যায় কারণ পরিমলেরা আর অমিয়রা সকলেই অবিবাহিত যুবক, এবং ওদের বিয়ে দেবার জন্য ঘরের মানুষ এখনও তেমন কিছু ব্যস্ত হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সুধাংশু যে প্রায় বিবাহিত। কে না জানে, হৃদয়বাবুর একমাত্র মেয়ে মাধুরীর সঙ্গে সুধাংশুর বিয়ের প্রস্তাব একেবারে পাকাপাকি সুস্থির হয়ে গিয়েছে? ছেলে নেই হৃদয়বাবুর, ঐ একটি মাত্র মেয়ে। অথচ সম্পত্তি অনেক। হৃদয়বাবুর মেয়ে মাধুরী দেখতেও বেশ সুন্দর। সুধাংশুর মত ছেলের সঙ্গেই যে মাধুরীর মত মেয়ের বিয়ে হলে ভাল হয়, এই সত্যও কে না স্বীকার করেন? হৃদয়বাবুর সব সম্পত্তি পাবে তাঁর জামাই সুধাংশু, এবং সুধাংশু

বিয়ের পরেই তিন বছরের জন্য বিলেত গিয়ে একটা পরীক্ষা দিয়ে আসবে, এই ব্যবস্থাও যে একেবারে হিসেব ক'রে তৈরি ক'রে রাখা হয়েছে। সুধাংশু যে সবই জানে! সুধাংশুর বাবাও যে বড় বেশি খুশি হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সুধাংশুর বাবার আর্থিক অবস্থাও সুবিধার নয়। টাকা-পয়সার অভাবের জন্যই সুধাংশু আর তিনটে বছর রিসার্চ করবার সুযোগ পেল না। বাধ্য হয়েই এক ছোট কোলিয়ারির তিনশো টাকা মাইনের ম্যানেজার হয়ে দিন কাটাচ্ছে সুধাংশু।

আর কিছুদিন পরেই হৃদয়বাবুর মেয়ের সঙ্গে যার বিয়ে হবে, এবং বিয়ের পরেই হৃদয়বাবুর টাকায় তিন বছরের মত বিলেতে থেকে যাকে পড়াশুনা করতে হবে, সেই মানুষ বিধু চৌধুরীর মেয়ের পাল্লায় প'ড়ে এ কী ভয়ংকর ভুল করছে! ওর সুনাম যে এখনি বিপন্ন হবে। ওর মতি-গতির রহস্য বুঝতে না পেরে স্বয়ং হৃদয়বাবুই যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবেন। হৃদয়বাবুর মেয়ে মাধুরীও কি শুনতে পাবে না? সুপ্রিয়া চৌধুরীর চা আর হাসিছড়ানো কথার মায়ার কাছে মুগ্ধ হয়ে বসে থাকবে যে-সুধাংশু, সেই সুধাংশুকে বিয়ে করতে মাধুরীর মনও কি বেঁকে বসবে না?

একদিন, দু'দিন, তারপর আরো দু'টো সপ্তাহ, সুধাংশুকে বিধু চৌধুরীর বাড়িতে রোজই সন্ধ্যায় যেতে দেখা যায়। এবং এত ভাল-ছেলে সুধাংশুকেও লোকের মনের সন্দেহগুলি আর ক্ষমা করতে পারে না। সুধাংশুর দুর্নামের গুঞ্জন প্রথমে মৃদু মৃদু, তারপর একেবারে মুখর হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

পথে যেতে যেতে সুপ্রিয়ার সঙ্গে সুধাংশুর কোনদিন সাক্ষাৎ হয় নি, এবং সুপ্রিয়াও গায়ে পড়ে সুধাংশুকে চা খেতে বলে নি। সুপ্রিয়ার ভাই পল্টুকে ম্যাজিক শেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে অমিয়র মত একটা ছুতো ধ'রে বিধু চৌধুরীর বাড়িতে আসেনি সুধাংশু। সত্যি সত্যি একটা কাজের দায়ে এক সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ সে বিধু চৌধুরীর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল সুধাংশু। বাইরের ঘরে তখন সুপ্রিয়ার গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অমিয়র এসরাজ বিভোর হয়ে বেজে চলেছে।

মস্ত বড় একটা কাপড়ের বাণ্ডিল এক হাতে কাঁধের উপর তুলে, আর দশ টাকার দশটা নোট হাতে নিয়ে বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে থাকে সুধাংশু। অকস্মাৎ সুপ্রিয়ার গান থেমে যায়, এবং দু'টি অতি তীব্র উৎসুক চক্ষু নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে বের হয়ে এসে সুপ্রিয়া হাসতে থাকে—এ কি ব্যাপার সুধাংশুবাবু?

সুধাংশু—আপনার বাবার সঙ্গে দেখা হল কোডারমা স্টেশনে। তিনি আরও পাঁচদিন পরে ফিরবেন। আপনার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য এই কাপড়ের বাণ্ডিল আর এই টাকা আমার কাছেই গছিয়ে দিলেন।

দুঃখ প্রকাশ করে সুপ্রিয়া।—তাই ব'লে আপনি নিজের হাতে এত বড় একটা বোঝা বয়ে নিয়ে এলেন কেন? চিঠি পাঠিয়ে একটা খবর দিলেই তো আমি রামসেবককে আপনার কাছে পাঠিয়ে এগুলি আনিয়ে নিতে পারতাম।

সুধাংশু হাসে—আপাতত বোঝাটা রাখি কোথায়?

সুপ্রিয়া লজ্জা পেয়ে নিজেকেই ধমক দেয়—আঃ, ছিঃ, আমি এতক্ষণ করছি কি? দিন, আমার হাতেই দিন।

হাত বাড়িয়ে সুধাংশুর হাত থেকে কাপড়ের বাণ্ডিলটা তুলে নেয় সুপ্রিয়া।

চলে যাচ্ছিল সুধাংশু। সুপ্রিয়া অনুরোধ করে—একটু বসুন সুধাংশু-বাবু, এক মিনিট।

রামসেবক নয়, নিজের হাতেই চা-এর কাপ নিয়ে এসে সুধাংশুর হাতের কাছে এগিয়ে দেয় সুপ্রিয়া।

চা খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ায় সুধাংশু। সুপ্রিয়া বলে—না, আর আপনার সময় নষ্ট করবো না।

সুপ্রিয়া নিজেই একটু সময় নষ্ট ক'রে সুধাংশুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে গেট পর্যন্ত আসে।

আর একদিন এসে চা খাবার জন্য সুধাংশুকে অনুরোধ করতে ইচ্ছা করে। হাসিমুখে চট্ ক'রে এই সামান্য একটু অনুরোধ ক'রে ফেললেই তো হয়। কিন্তু হাসতে গিয়ে বারবার গম্ভীর হয়ে যায় সুপ্রিয়ার চোখ দুটো, অনুরোধটা মুখের কাছে এসে বারবার আটকে যায়।

শেষ পর্যন্ত অনুরোধ ক'রেই ফেলে সুপ্রিয়া—আপনি কি আর একদিন একটু সময় নষ্ট করতে পারবেন?

সুধাংশু হাসে—আর একবার এসে চা খাবার জন্য?

সুপ্রিয়া—হ্যাঁ, বুঝেই তো ফেলেছেন।

সুধাংশু বলে—আসবো।

চলে যায় সুধাংশু। অমিয়র হাতের এসরাজ আবার সুর ছড়াতে আরম্ভ করে। কিন্তু যার গলার গানকে আপন ক'রে কাছে ধরে রাখবার জন্য অমিয়র এসরাজের এই আকুলতা, সে কোথায়? যেন এই উল্লাসের

ছন্দ ভেঙ্গে দিয়ে সুপ্রিয়া অন্য কোন এক কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ঘুরঘুর করছে।

ঠিকই অনুমান করেছে অমিয়রা। ভিতরের বারান্দার উপর বসে এখন ব্যস্তভাবে কাপড়ের বাণ্ডিল খুলছে সুপ্রিয়া। নোটগুলিকে রুমালে বাঁধছে। পল্টুকে হাঁক দিয়ে ডাকছে। মণ্টুকে নতুন প্যাণ্টটা পরিয়ে দেখছে। সংসারের কাজের জন্য যেন হঠাৎ মায়া উথলে উঠেছে সুপ্রিয়ার মনে।

অমিয় তার এসরাজ থামায়। এই কয়েক মিনিটের ঘটনার মধ্যে একটা নতুন বিস্ময়ের রহস্য যেন ফুটে উঠেছে, চুপ ক'রে বসে বোধ হয় তাই দেখতে থাকে অমিয়দের মনের চোখ। যে সুপ্রিয়া কোনদিন অমিয়দের কাউকেই নিজের হাতে চা-এর কাপ এনে চা খেতে অনুরোধ করেনি, সেই সুপ্রিয়া আজ যে বেশ স্বচ্ছন্দ আর বেশ খুশি হয়ে নিজের হাতে চা-এর কাপ নিয়ে সুধাংশুর হাতের কাছে তুলে ধরলো! সুধাংশুর সঙ্গে গেট পর্যন্ত এগিয়েও গেল। এ যে সুপ্রিয়ার বড় বেশি ভদ্রতা। কোনদিন পরিমলের মত মানুষকেও গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেনি সুপ্রিয়া। সুধাংশুর সঙ্গে কথাও তো বলেছে সুপ্রিয়া। কে জানে কি কথা, আর কেমন ক'রে হেসে হেসে কথাগুলি বলেছে সুপ্রিয়া।

অমিয়দের চোখ ভুল সন্দেহ করেনি। এক সপ্তাহ যেতে না যেতে তিনবার সুধাংশুকে চা খেতে আসতে দেখে শুধু সুধাংশুকেই ভাল ক'রে চিনতে পেরেছিল অমিয়রা। কিন্তু তখনো বুঝতে পারেনি যে, সুপ্রিয়াকেই ভাল ক'রে চিনে ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে।

দশটা দিন পার হতেই অমিয়রা বেশ ভাল ক'রে চিনে ফেললো সুপ্রিয়াকে। সুপ্রিয়ার গানের সঙ্গে এসরাজ বাজাবার জন্য বৃথা আর আশা না করাই ভাল। সুধাংশু আসা মাত্র যে সব ভুলে যায় সুপ্রিয়া। আরও অদ্ভুত, সুধাংশুকে যেন চীফ গেস্টের মত বিশেষ আদর আর বিশেষ সম্মানে তুষ্ট করার জন্য সবার ভিড়ের হাসি ও হল্লা থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখে সুপ্রিয়া। অমিয়রা যখন বাইরের ঘরের ভিতরে, সুধাংশু তখন বারান্দার চেয়ারে। অমিয়রা যখন বারান্দায়, সুধাংশু তখন সামনের ঘেসো জমির উপর একটা বেতের মোড়ার উপর। অমিয়দের চোখের সামনে সুপ্রিয়ার মুখ সব সময়ই এবং শুধুই হাস্যোজ্জ্বল, আর সুধাংশুর চোখের সামনে সুপ্রিয়ার সেই মুখই তো মাঝে মাঝে বেশ গম্ভীর, আর চোখ দুটি তো বেশ শান্ত।

আর বেশি দিন নয়, বিধু চৌধুরীর বাড়ির গরম চা-এর ঝরনার উত্তাপ আর সহ্য করতে না পেরে অদৃশ্য হয়ে গেল অমিয়রা। এবং তারপর বেশিদিন নয়, অমিয়দের আতঙ্ক আক্ষেপ আর অস্বস্তিভরা নিঃশ্বাসের রটনায় এই সত্য জানতে আর কারও বাকি থাকে না যে, বেচারা অমিয়রা পালিয়ে আসতে পেরেছে আর বেঁচেছে। কিন্তু সুধাংশুর বোধ হয় বাঁচবার আশা নেই।

এই অভিযোগের প্রমাণও স্বচক্ষে দেখা যায়। বিধু চৌধুরীর বাড়ির সেই উল্লাসের মৌচাক ভেঙে গিয়েছে, একেবারে গুঞ্জনহীন একটা স্তব্ধতা। না ক্যারম, না হারমনিয়ম, না ব্যাডমিণ্টন; সবই যেন উল্লাস হারিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু দু'টি মূর্তি। সুধাংশু আর সুপ্রিয়া। কখনও ঘরের ভিতর, কখনও বা বারান্দায়, এবং প্রায়ই চুনের দাগ-আঁকা ব্যাডমিণ্টন লনের ঘাসের উপর দু'টি বেতের মোড়ার উপর মুখোমুখি বসে, কে জানে কিসের গল্প করে ওরা দু'জন।

হাতে একটা পাখা নিয়ে সুপ্রিয়া যেদিন সুধাংশুকে বাতাস করবার জন্য হঠাৎ মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ালো, সেদিন যেন এক পলকের চমক খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল সুধাংশুর।

সুধাংশু আশ্চর্য হয়ে বলেন—এ কি করছো তুমি?

সুপ্রিয়া গম্ভীর মুখ নিয়েই বলে—আমার যা ভাল লাগছে, তাই করছি।

সুধাংশু ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায়—তুমি না বুঝে ভুল করছো সুপ্রিয়া, তুমি নিজেরই ক্ষতি করছো।

সুপ্রিয়া বলে—নিজের ক্ষতির কথা ভাবি না, ভাববার দরকার নেই।

পাখা থামিয়ে কি-যেন ভাবে সুপ্রিয়া। তারপরেই আরও জোরে হাত চালিয়ে, যেন অদ্ভুত এক গম্ভীর মনের বেপরোয়া উল্লাসে, পাখার বাতাস ছাড়াতে থাকে সুপ্রিয়া। তারপর বলেই ফেলে—আপনি আর এখানে চা খেতে আসবেন না, এই তো ভয়। সেই ভয়ের জন্য তৈরী হয়েই আছি।

দু'চোখ বন্ধ ক'রে, এবং একটু ভয় পেয়েই কিছুক্ষণ পাখার বাতাস সহ্য করে সুধাংশু, তার পরেই চলে যায়।

হয়তো এই বাড়ির গেটের কাছে সুধাংশুর ছায়া আর দেখা দিত না কোনদিন। সুপ্রিয়া চৌধুরীর হাতের এগিয়ে দেওয়া চা-এর কাপ আর ঐ পাখার বাতাসের সংকল্প স্পষ্ট ক'রে বুঝে ফেলতে আর একটুও দেরি হয়নি। তবু সুধাংশুর আসতে হলো একদিন। বিধু চৌধুরীর বাড়ির চায়ের

জন্ম তৃষ্ণার্ত হয়ে নয়, সুপ্রিয়ার হাতের পাখার বাতাসকে ধিক্কার দেবার জন্যই মনের এক জ্বালা নিয়ে ছুটে আসে সুধাংশু। সুধাংশুর জীবনেরই একটা ক্ষতি হতে চলেছে, এবং সেই ক্ষতির কারণ হলো সুপ্রিয়া।

সুধাংশু বলে—তুমি যে নিতান্ত একটি দুর্নামের মেয়ে, একথা আমি জানতাম না, এবং জানতাম না বলেই তোমার যত ছল নেমন্তন্নের পাল্লায় পড়ে এখানে এসে এসে দুর্নাম কুড়িয়েছি।

সুপ্রিয়া—এই কথা বলবার জন্যই কি এসেছেন?

সুধাংশু—বলতে এসেছি, তুমি আমার যা ক্ষতি করবার তা' তো করলেই, কিন্তু আর কারও ক্ষতি করো না। ভদ্রলোকের মেয়ে একটু ভদ্রভাবে সুখী হতে চেষ্টা কর।

সুপ্রিয়া—আপনার কি ক্ষতি হলো বুঝতে পারছি না।

সুধাংশু—হৃদয়বাবু আমার দুর্নাম শুনে ভয় পেয়েছেন। বাবার কাছে এসে বলেই গিয়েছেন যে, তিনি এখন বেশ কিছুদিন দেরি করতে চান। আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন কি না, সেটা আর একবার ভেবে দেখতে চান।

সুপ্রিয়া—বিয়ের কথা কি ঠিক হয়েই গিয়েছিল?

সুধাংশু—সবই ঠিক ছিল, বিয়ের পর আমার বিলেত গিয়ে পড়াশুনা করবার ব্যবস্থাও ঠিক হয়েছিল। তার জন্য হৃদয়বাবুই টাকা দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন।

সুপ্রিয়া দুই অপলক চক্ষুর তীব্র আগ্রহ নিয়ে শুনতে থাকে সুধাংশুর এই ধিক্কার আর অভিযোগ। তারপরেই শান্তভাবে প্রশ্ন করে—যদি আমি আপনার সুনাম রটিয়ে দিতে পারি তা হ'লে বিয়ে ভেঙে যাবে না তো?

সুধাংশুর মুখের হাসিতে যেন কঠোর এক শ্লেষ শিউরে ওঠে—তুমি আমার সুনাম বাঁচিয়ে তুলবে? কিছু বলবার না থাকলেও এইরকম বাজে কথা বলতে হয় না, অন্তত আমার কাছে বলে কোন লাভ নেই।

সুপ্রিয়া—কেন বলুন তো?

সুধাংশু—আমি তোমাকে চিনেছি।

চলে যায় সুধাংশু।

এর পরে আর বোধহয় একটা মাসও পার হয়নি, যেদিন উস্ত্রীর বুকে ভরা আষাঢ়ের ঢল নেমেছিল।

এরই মধ্যে অদ্ভুত এক ঘটনাও ঘটে গিয়েছে। হৃদয়বাবু এসে সুধাংশুর বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে গিয়েছেন। সুধাংশুর মত ছেলের মতিগতি সম্বন্ধে তাঁর যে ভুল সন্দেহ হয়েছিল, সেই ভুলের জন্য তিনি লজ্জিত, অনুতপ্ত, দুঃখিত। সুধাংশুর বিপন্ন সুনাম আবার নতুন ক'রে এবং আরও প্রশংসার গৌরবে মহীয়ান হয়ে এই পাড়া আর ঐ পাড়ার প্রায় সব বাড়ির মুখে মুখে বেজে উঠেছে। এই মাসের মধ্যেই কোন একটি ভাল দিনে সুধাংশুর সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে চুকিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন হৃদয়বাবু। সুধাংশুর বাবা বলেছেন—তবে তাই হোক।

কিন্তু কি আশ্চর্য আর ক'দিন পরে হৃদয়বাবুর মেয়েকে বিয়ে ক'রে এবং তার কিছুদিন পরে যার বিলেত চলে যাবার কথা, সেই সুধাংশু ধীরে ধীরে এক মেঘলা সন্ধ্যায় আস্তে আস্তে হেঁটে বিধু চৌধুরীর বাড়ির বারান্দায় উপর এসে দাঁড়ায়।

বাইরের ঘরে একটি তক্তাপোশের উপর বাক্স-বন্ধ হারমনিয়ম। তারই উপর একটা খোলা বই। এবং সেই খোলা বইয়ের উপর কপাল উপুড় ক'রে দিয়ে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে সুপ্রিয়া।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সুধাংশু। ঐ তো সেই দুর্নামের মেয়ে, যে মেয়ে নিজের বুকে ইচ্ছা ক'রে আর এক দুর্নামের ছুরি বসিয়েছে। কিন্তু তবু কেমন চুপটি ক'রে আর শান্তটি হয়ে স্বচ্ছন্দ ঘুম ঘুমোচ্ছে।

আস্তে আস্তে হেঁটে এগিয়ে যায় সুধাংশু, সুপ্রিয়ার মাথার কাছে এসে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তেই ডাকে—সুপ্রিয়া।

চমকে উঠলেও মুখ তুলতে পারে না সুপ্রিয়া। সুধাংশু বলে—বেশ তো, সময় দিচ্ছি, ভাল ক'রে চোখ মুছে নিয়ে তারপর তাকাও।

মুখ না তুলেই সুপ্রিয়া বলে—আপনি আজ আবার কেন এলেন?

সুধাংশুর গলার স্বর যেন আবার এক দুঃসহ বিস্ময়ের জ্বালায় তপ্ত হয়ে বেজে ওঠে—আমার সুনাম রটেছে আবার, কিন্তু তোমার কি লাভ হলো সুপ্রিয়া?

সুপ্রিয়া—আপনার ক্ষতি হলো না, এই লাভ।

সুধাংশু চেঁচিয়ে ওঠে—কিন্তু এরকম জঘন্যভাবে তুমি আমার সুনাম রটালে কেন সুপ্রিয়া? ছিঃ!

সুপ্রিয়া—কে বললে আমি আপনার সুনাম রটিয়েছি?

সুধাংশু ক্রুদ্ধ স্বরে যেন ধিক্কার দিয়ে বলতে থাকে—মাধুরীর মেজদির

কাছে কে গিয়ে গল্প করেছে? তুমিই আমার হাত চেপে ধরেছিলে একদিন, আর আমিই ঘেন্না ক'রে তোমার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছি, এই মিথ্যা অদ্ভুত ভয়ংকর গল্প কে নিজের মুখে হেসে হেসে বলে এসেছে মাধুরীর মেজদির কানের কাছে?

সুপ্রিয়া—মিথ্যে কথা ঠিকই, কিন্তু বড় দুর্নামের মেয়ের দুর্নাম তাতে এমন কিছু বাড়েনি। আমার কোন ক্ষতি হয়নি, অথচ আপনার লাভ হলো।

সুপ্রিয়ার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে সুধাংশু। চোখ দুটোও যেন হঠাৎ পিপাসিতের মত চলছল ক'রে জল খোঁজে।

সুপ্রিয়ার মুখটা করুণ হয়ে ওঠে—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

সুধাংশু—কি ক্ষমা করবো?

সুপ্রিয়া—আমার মিথ্যা কথা।

সুধাংশু—কেমন ক'রে ক্ষমা করবো?

সুপ্রিয়া হাসে—আজ শেষবারের মত চা খেয়ে আর রাগ না ক'রে চলে যান।

মুখ ঘুরিয়ে, চোখ লুকিয়ে, ব্যস্তভাবে চা আনবার জন্য উঠে দাঁড়ায় সুপ্রিয়া। কিন্তু চলে যেতে পারে না সুপ্রিয়া। হাত বাড়িয়ে সুপ্রিয়ার একটি হাত শক্ত ক'রে ধ'রে ফেলে সুধাংশু।

সুপ্রিয়া চমকে ওঠে, ভয় পায়, চোখ তুলে তাকাতে পারে না—আপনি কেন ভুল করছেন সুধাংশুবাবু?

সুধাংশু—তোমার একটা মিথ্যে গল্প শুধু আমার হাত ধরেছিল, কিন্তু আমি যে সত্যি সত্যি তোমার হাত ধরলাম। বিশ্বাস না হয়, তাকিয়ে দেখ ভাল ক'রে।

তারপর, উত্রীর বুক প্লাবিত ক'রে আরও কয়েকবার আষাঢ়ের ঢল নেমেছিল, এবং বিধু চৌধুরীর বাড়ির এই ঘরেরই জানালার কাছে বসে সেই প্লাবন দেখে একা একাই নীরবে হেসেছিল সুপ্রিয়ার জলভরা চোখ।

এবং, তারপর আর বেশিদিন নয়। বিধু চৌধুরীর এই বাড়ির দিকে তাকাতে গিয়েই পথের লোক বুঝতে পারে, ওটি একটি বিয়ের বাড়ি।

কবে নীরব হবে কথামালা ?

কবে একটু নীবর হবে এই মেয়ে, ধ্রুবজ্যোতির মেজবউদি যার নাম দিয়েছে কথামালা, যার সত্যি নাম হলো বিনীতা মল্লিক ?

মুরলী প্রেসের ম্যানেজারের কাজ করেন যে রাইচরণ মল্লিক, তিনি এই পাড়াতেই, ধ্রুবজ্যোতিদের এই ঝকঝকে বাড়িটারই পিছনে সরু রাস্তার ধারে একটি সেকেলে চেহারার পুরনো বাড়ীতে থাকেন। তাঁরই মেয়ে বিনীতা।

ঝকঝকে চেহারার মেয়ে না হয়েও ধ্রুবজ্যোতিদের এই ঝকঝকে বাড়িতে রোজ আসে বিনীতা, আর কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে এই বাড়ির মানুষগুলির মনগুলিকে,·· না, ঠিক ভিজিয়ে দিয়ে যেতে পারে না বিনীতা। বিনীতার কথা শুনে এই বাড়ির মানুষগুলির মন শুধু হাসে, ছটফট করে আর মজা পায়।

ষ্ট্যাটিসটিক্‌সের মোটা মোটা বই, যার মধ্যে শুধু রাশি রাশি অঙ্ক কিলবিল করে, সেই বই-এর পাতার উপর থেকে গভীর মনোযোগের চক্ষু তুলে মুখ ফিরিয়ে তাকাতে আর হাসতে বাধ্য হয় ধ্রুবজ্যোতি। কথা বলতে আরম্ভ করেছে বিনীতা। পাঁচটা সেকেণ্ডও থামে না। হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বাধা দিলেও উত্তর দিতে দু' সেকেণ্ডও দেরি করে না বিনীতা। ওর মুখের ভাষা যেন কোন ভাবনার অপেক্ষায় এক মুহূর্তও থমকে থাকে না।

ধ্রুব হাসে, ধ্রুবর বোন শোভা হাসে, আর মেজবউদিও হেসে হেসে আবার প্রশ্ন করেন—শুনলাম, তুমি নাকি ঘরের ভেতরে একাই কথা বল বিনীতা ?

বিনীতা—তা বলি বৈকি।

শোভা—ঘুমের মধ্যেও কথা বল বোধ হয়।

বিনীতা—হ্যাঁ, সেদিন বাবাই তো হঠাৎ ঘরে ঢুকে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে বললেন, বিড়বিড় ক'রে কি বকছিস্ বিনী ?

ধ্রুব—স্বপ্নের মধ্যেও কথা বল নিশ্চয়।

বিনীতা—হ্যাঁ, মা'কে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন। একদিন স্বপ্নের মধ্যে আস্ত একটা গানই গেয়ে ফেলেছিলাম।

মেজবউদি—কিন্তু তুমি একটু চুপ করবে কবে ?

বিনীতা—কোনদিনও না। যেদিন সবাইকেই চোখ বুঁজে চিরকালের মত চুপ ক'রে যেতে হয় সেদিনও আমি বোধ হয় চুপ ক'রে থাকতে পারবো না।

ধ্রুব—তার মানে?

বিনীতা—একেবারে চুপ করার আগেও একটা কথা বলে নেব।

ধ্রুব—কি কথা?

বিনীতা—এইবার আমাকে চুপ করিয়ে দাও ভগবান।

ঘরসুদ্ধ মানুষ হাসে। ধ্রুব মেজবউদি আর শোভা। বিনীতা সত্যিই কথামালা। শুধু কথার জন্যই অনর্গল কথা বলে আর লোক হাসায় বিনীতা। বিনীতা চলে যাবার পরেও এই ঝকঝকে বাড়ির মানুষগুলির মুখে এই প্রশ্ন হাসতে থাকে, কবে নীরব হবে কথামালা?

কিন্তু শুধু এই একটি প্রশ্ন নয়, আরও একটি প্রশ্ন এই বাড়ির ভিতরে মুখর হয়ে হাসতে থাকে। বিনীতার মুখরতার কোন অর্থ নেই, না থাকুক, কিন্তু এই বাড়িতে আসে কেন বিনীতা? বিনীতার এই বাড়ীতে রোজই একবার বেড়াতে আসার ব্যাপারটাও কি নিতান্তই অর্থহীন?

এক জোড়া ময়লা মখমলের চটিকে চটপট শব্দ ক'রে যেন দু'পায়ে বাজাতে বাজাতে পথ চলে বিনীতা। পথে যেতে মুখোমুখি দেখা হয় সুব্রতার জেঠামশাই মাধবাবুর সঙ্গে। মাধববাবু হেসে হেসে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন—ভাল আছ তো বিনীতা?

বিনীতা—ভাল তো থাকবোই জেঠামশাই। দু'বেলা ফুলকপির খিচুড়ি চালাচ্ছি, যা সস্তা হয়েছে ফুলকপি, ভাল না থেকে পারবো কেমন ক'রে বলুন?

চলে গেলেন সুব্রতার জেঠামশাই। বিনীতাও তার তড়বড়ে দুই পায়ে ময়লা মখমলের চটি বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যায়। দেখা হয় শুভ্রার মাসীমার সঙ্গে। শুভ্রার মাসীমা প্রশ্ন করেন—কোথায় চললে বিনীতা, কি মনে ক'রে?

বিনীতা বলে—কিছু মনে ক'রে কোথাও যাচ্ছি না। মন থাকলে তো মনে করবো মাসীমা? শুভ্রার বর যে এসেছিল, আর শুভ্রা যে আমাকে একবার যেতে বলেছিল, সে কথা একটি বার মনেও পড়লো না। আমার মনই নেই মাসীমা, শুধু আমি আছি।

কেউ প্রশ্ন না করলেই বা কি? বিনীতা মল্লিক যেন শুনতে পায়,

বাতাস জুড়ে প্রশ্ন ভাসছে। এবং কেউ কোন প্রশ্নের লজ্জায় চুপি-চুপি মুখ আড়াল ক'রে সরে পড়বার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়, বিনীতাই প্রশ্ন ক'রে তাকে পথের উপর থামিয়ে রাখে।

যেতে যেতে হঠাৎ পথের উপর থমকে দাঁড়াল বিনীতা। দেখতে পেয়েছে বিনীতা, বেশ সেজে-গুজে স্বামীর সঙ্গে কোথায় যেন চলেছে অনুরাধা। মুখটা আড়াল ক'রে বিনীতার পাশ কাটিয়েই চলে যাচ্ছিল অনুরাধা, কিন্তু খপ্ করে অনুরাধার একটা হাত ধরে ফেলে বিনীতা। স্বামী ভদ্রলোক দু'পা এগিয়ে এবং একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরান।

বিনীতা প্রশ্ন করে—শ্বশুরবাড়ি থেকে কবে ফিরলে অনু?

অনুরাধা বলে—কাল।

বিনীতা—এখন যাচ্ছ কোথায়?

অনুরাধা—বেড়াতে।

বিনীতা—কিন্তু শুধু দু'জনে কেন? তৃতীয় ব্যক্তিকে কার কাছে রেখে এলে?

অনুরাধা আশ্চর্য হয়—তার মানে?

বিনীতা চেঁচিয়ে ওঠে—তোমার বেবি কোথায়?

অনুরাধা—আঃ পথের মাঝে চেঁচিয়ে পাগলামি করো না বিনীতা!

বিনীতা—পাগলামির কি দেখলে? চেঁচিয়ে কথা বলছি বলে?

অনুরাধা হাসে—বিয়ের পর ছ'মাসও যেতে না যেতে বেবি কেমন ক'রে পাওয়া যায়?

বিনীতা অনুরাধার হাত ছেড়ে দেয়—এক্সকিউজ মি ম্যাডাম। কিছু মনে করো না।

ঘাড় ঝাঁকিয়ে এলোমেলো খোলা চুলের বোঝা পিঠের উপর তুলে দেয় বিনীতা। আঁচলটা হাওয়ার দোলায় বার বার কাঁধ থেকে খসে পড়ে যায়। আঁচলের একটা কোণ খপ ক'রে ধরে গলার চারিদিকে জড়িয়ে ক্রস্ ক'রে একটা ফাঁস এঁটে দেয় বিনীতা। তারপর আবার সেই রকমই ভঙ্গীতে দু'টি তড়বড়ে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে আর ময়লা মখমলের চটির শব্দ বাজাতে বাজাতে চলে যায়।

একটু সাজলে নিশ্চয়ই ভাল দেখাবে বিনীতাকে। কিন্তু সাজের নামে দিব্যি। শুভ্রার বিয়ের দিনে, একটা উৎসবের বাড়িতে এতবড় রঙীন একটা ভিড়ের মধ্যে যেতে হয়েছিল বিনীতাকে; সেদিনও দেখা গেল, ভাল করে

চুল পর্যন্ত আঁচড়ায়নি বিনীতা। বোধ হয় রান্না করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল যে, শুভ্রার বিয়েতে যেতে হবে। শাড়ির গায়ে এখানে ওখানে হলুদের দাগ লেগে রয়েছে, কিন্তু তার জন্য বিনীতার চোখে কোন দুশ্চিন্তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

কিন্তু বিনীতা কখনও রাগ করেছে বলে শোনা যায়নি। কথার চাল চুলো নেই, রাইচরণ মল্লিকের ঐ আধ-পাগলা মেয়েটার মুখরতার জন্য পাড়ার কোন ঘটনায় মন গম্ভীর হয়ে যায় না। ওর কথা ধরতে নেই, ওর কথার কোন অর্থ হয় না। ওর কথার কোন মূল্য নেই।

—আবার এস বিনীতা। শুভ্রা হোক, সুব্রতা হোক, কিংবা অনুরাধা, সকলেই বিনীতাকে হেসে হেসে বিদায় দিতে পারে। ওরা খুশি হয়েই বিনীতাকে আর একবার আসবার জন্য অনুরোধ করে। এ ছাড়া ওদের হাসির মধ্যেও আর কোন অর্থ নেই।

কিন্তু ঐ একটি বাড়ির হাসি, ধ্রুবজ্যোতিদের ঝকঝকে বাড়ির হাসিটার মধ্যে যেন কঠিন একটা অর্থ লুকিয়ে আছে। ধ্রুব হাসে, মেজবউদি হাসেন, আর হাসে শোভা। ঝকঝকে বাড়িটা বিনীতার মুখরতায় হো হো ক'রে হেসে যেন বলে দিতে চায়—যাও বিনীতা।

কিন্তু বিনীতা তবু আসে। বিস্ময়ের কথা এই যে, এই বাড়িতে বিনীতা প্রায় রোজই আসে। এত আনমনা বিনীতা, মনই নেই যে বিনীতার, সেই বিনীতার বোধ হয় ঠিক মনে পড়ে যায়, সায়েন্স কংগ্রেস থেকে আজ ফিরে এসেছে এই ঝকঝকে বাড়ির ধ্রুবজ্যোতি সেন। নইলে ঠিক এই পনর দিন বাদ দিয়ে আজ এই সময় হঠাৎ কেমন ক'রে আর কেন এসে দেখা দেয় বিনীতা?

এই বাড়ির মনগুলিকে নিয়ে যেন মনের মত খেলা করবার একটা লোভে পেয়ে বসেছে বিনীতাকে! এই বাড়ির মনগুলি অবশ্য সেজন্য একটুও দুশ্চিন্তা করে না। ঝকঝকে বাড়ির চকচকে মনগুলি বেশ সাবধানেই থাকে। বিনীতা একটা খেলা খেলতে আসে, ওরাও বিনীতাকে যেন অবাধভাবে খেলতে দিয়ে আর খেলিয়ে খেলিয়ে ক্লান্ত ক'রে দেয়। না ধ্রুব, না মেজবউদি, না শোভা, কারও মুখের হাসি ক্লান্ত হয় না। বরং শেষে দেখা যায়, বিনীতারই মুখরতা যেন একটু হাঁপিয়ে আর ক্লান্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। আবার এস বিনীতা, একথা হেসে হেসে বলতে পারে না এই ঝকঝকে বাড়ির চকচকে

মনগুলি। ওরা জানে, না বললেও আসবে বিনীতা। তা ছাড়া মুরলী প্রেসের ম্যানেজার রাইচরণ মল্লিকের মেয়েকে মৌখিক ভদ্রতার ঐ ক'টি কথা না বললেও তো চলে।

ধ্রুবজ্যোতি সেনের এখনও বিয়ে হয়নি। মেজদা এইবার তাই খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, মেজবউদিরও মনের ব্যস্ততার অন্ত নেই। খুব তাড়াতাড়ি, এক মাসে না হয় বড় জোর হু'মাসের মধ্যে ধ্রুবর বিয়ে দিতেই হবে। ধ্রুবর বিয়ে দিতেই হবে। ধ্রুবর লেখা একটি প্রবন্ধ পড়ে প্ল্যানিং কমিশন খুশি হয়ে ধ্রুবকে একটা সার্ভিস নেবার জন্য দিল্লীতে ডেকেছেন! বোধহয় দিল্লীতেই থাকতে হবে। আর দেরি করা যায় না।

নানা জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে চিঠি আসছে। মেয়ের ফটো আসছে। সেই সব চিঠির স্তূপ থেকে একটা চিঠি পড়ে, আর সব ফটোর স্তূপ থেকে একটি ফটো বের ক'রে মেজবউদি বলেন—বাস এই মেয়ে, এই মেয়েকেই চাই!

শোভা বলে—হ্যাঁ, এর চেয়ে ভাল মেয়ে খুঁজতে হলে পরীর দেশে যেতে হয়। মেজদাকে বল, আর একটুও দেরি না করে এই মেয়ের সঙ্গে রাঙাদার বিয়ে ঠিক ক'রে ফেলতে।

ধ্রুব এসে বলে—দেখি ফটো।

ফটো দেখবার পর ধ্রুব বলে—মেয়ের অন্য খবর একটু শোনাও দেখি মেজবউদি!

মেজবউদি বলেন—গ্র্যাজুয়েট, খেয়াল আর ঠুংরির কম্পিটিশনে পাঁচবার মেডেল পেয়েছে।

ধ্রুব হাসে—তবে আর কি?

ধ্রুবর মুখ দেখেই বোঝা যায়, ফটো দেখে ধ্রুবর চোখ দুটো হঠাৎ বড় বেশি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই রকম একটি সুন্দর মুখ বোধ হয় কল্পনায়ও আশা করেনি ধ্রুব।

ঠিক এই সময়ে ঘরের ভিতরে এসে দেখা দেয় কথামালা বিনীতা। এবং কারও কোন প্রশ্নের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই প্রশ্ন করে—ধ্রুবদার বিয়ের কি করলে মেজবউদি?

মেজবউদি বলেন—সবই করছি।

বিনীতা—তার মানে?

শোভা বলে—মেয়ে পছন্দ করাও হয়ে গিয়েছে।

বিনীতা—মেয়ের ফটো আছে ?

মেজবউদি—আছে বৈকি।

বিনীতা—কোথায় ? দেখি একবার।

শোভা—ঐ যে রাঙাদার হাতে।

বিনীতাই এগিয়ে যায়; প্রায় ছোঁ মেরে ধ্রুবর হাত থেকে ফটো তুলে নিয়ে ছু' চোখের কৌতূহল ঢেলে দেখতে থাকে। তাই বোধ হয় দেখতে পায় না বিনীতা, মেজবউদি মুখ টিপে হেসে হেসে শোভার হাতে একটা চিমটি কেটে ফেললেন, আর ধ্রুব মৃদু হেসে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

—বাঃ, বেশ মেয়ে; বড় সুন্দর মেয়ে। ধ্রুবর হাতে ফটো ফিরিয়ে দিয়েই বিনীতা তার কথার ফোয়ারা ছড়াতে আরম্ভ করে। চুপ ক'রে, এবং মাঝে মাঝে যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে শুনতে থাকে ধ্রুব। আর, শোভা ও মেজ-বউদি ভুরু টান ক'রে শুনতে থাকেন। বিনীতা যেন আপন মনের আবেগে একটা থিয়েটারের আসরে দাঁড়িয়ে অভিনয় ক'রে চলেছে।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে না বিনীতা। ছটফটে প্রজাপতির মত ঘরের বাতাসে এদিকে আর ওদিকে যেন উড়ে উড়ে বসছে বিনীতা। আবার উঠে গিয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। কারও মুখের দিকে তাকিয়ে নয়; বিনীতা যেন কোন এক দূরের আকাশের দিকে অচঞ্চল ছু'চোখের লক্ষ্য রেখে কথা বলে চলেছে। বলতে বলতে নিজেই মাঝে মাঝে ঝংকার দিয়ে হেসে উঠছে।—বেশ মেয়ে, বেশ সুন্দর মেয়ে, কিন্তু এই মেয়েকে দেখে তো সেই মনে হয় না, যে মেয়ে চুপি চুপি আস্তে আস্তে, পা টিপে টিপে, চোরের মত পিছন থেকে এসে ধ্রুবদার কানে ফুঁ দিয়ে পালিয়ে যাবে। না মেজবউদি, এরকম মেয়ে হলে চলবে না।

মেজবউদি—কেমন মেয়ে হলে চলবে ?

বিনীতা—তবে শোন, এত ফর্সা হলেও চলবে না। একটু শ্যামল বরণ হবে ধ্রুবদার বউ। চোখ ছুটো একটু বোকা বোকা। ধ্রুবদাকে চা দিতে এসে যেন চা দিতে ভুলেই যায়; আর ধ্রুবদার মুখের দিকে যেন ডগমগ হয়ে তাকিয়ে থাকে সে মেয়ের চোখ। তার কপালে ছোট একটি খয়েরের টিপ। ধ্রুবদা হেসে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতেই চমকে উঠবে, আর হেসে ফেলবে মেয়ে। আঁচল তুলে মুখের হাসি ঢাকতে গিয়েই এলোমেলো হয়ে যাবে হাতটা, খয়েরের টিপ একটু থেবড়েও যাবে, তারপর…।

শোভা বলে—বলে যাও, থামলে কেন বিনীতা ?

বিনীতা—তারপর একটি পাট-ভাঙা তাঁতের শাড়ি পরে ধ্রুবদার একেবারে কাছে না এসে একটু দূরে এসে দাঁড়াবে সেই মেয়ে। ধ্রুবদার হাতের বই-এর উপর সেণ্ট-মাখানো রুমাল ছুঁড়ে দিয়ে আর চোখের দুই ভুরুতে একটু রাগস্ত কাঁপুনি কাঁপিয়ে গম্ভীর হয়ে বলবে, আজ তোমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারবো না।

বিনীতার চোখেও অপলক হাসিটা যেন হঠাৎ একটু নিভু নিভু হয়ে আসে। মেজবউদি হেসে হেসে বলেন—তারপর কি হবে বিনীতা? বলে যাও, আরও বল, থামলে চলবে না।

বিনীতা বলে—তারপর ঐ পার্কের একটি কোণে; সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকবে সেই মেয়ের চোখ, কিন্তু এক হাত দিয়ে ধ্রুবদার একটা হাত ধরেই থাকবে।

বলতে বলতে যেন এলিয়ে পড়তে চায় বিনীতা। ক্লান্ত হয়ে আসছে কথামালার মুখরতা। শোভা বলে—থামলে কেন বিনীতা?

বিনীতা বলে—কত লোক তাকাতে তাকাতে চলে যাবে, কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারবে না। তাঁতের শাড়ির আঁচলটাকে এমন কায়দা ক'রে ছড়িয়ে দেবে সেই মেয়ে যে, একেবারে ঢাকা পড়ে থাকবে সে মেয়ের মিষ্টি হাতের ঐ খেলা। এইরকম একটি দস্তুর মত চালাক-বোকা মেয়ে চাই, তা না হলে ধ্রুবদার মত মানুষের সঙ্গে একটুও মানাবে না।

শোভা বলে—কথা ফুরিয়ে গেল নাকি বিনীতা?

বিনীতা ব্যস্তভাবে বলে—আজ আসি।

বিনীতার ক্লান্ত মুখরতার সেই প্রতিধ্বনি শুনেই হাসির উচ্ছ্বাস একেবারে কলরোল তুলে বেজে উঠতে থাকে মেজবউদি আর শোভার মুখে। ধ্রুবও চোখ ফিরিয়ে তাকায় আর হাসি হাসি চোখ নিয়ে দেখতে থাকে, রাইচরণবাবুর মেয়ে বিনীতা তার ময়লা মখমলের চটির শব্দ বাজাতে বাজাতে চলে যাচ্ছে। যেন বিনীতার মুখরতার আত্মাটাই জব্দ হয়ে আর ক্লান্ত হয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে।

অনেকদিন আগেই সন্দেহ করতে পেরেছিলেন ব'লে মেজবউদি আজ খুব সহজেই বুঝতে পারেন, বিনীতার এই কথাগুলিকে শুনলে যতটা আবোল-তাবোল ব'লে মনে হবে, ভেবে দেখলে ততটা আবোল-তাবোল ব'লে মনে হবে না। মেজবউদির অনেকদিন আগেই মনে হয়েছে, শোভার মনে হয়েছে কিছুদিন আগে, আর ধ্রুব এই সেদিন থেকে মনে করতে আরম্ভ করেছে, কেন

বিনীতা এই বাড়িতে বার বার আসে। যে আশা করা উচিত নয়, যে আশা বিনীতার মত মেয়ের পক্ষে ধারণ করাই উচিত নয়, সেই আশাই যে বিনীতার মনের মধ্যে খেলা করে, সেটা বিনীতার চোখ দেখেই বুঝে ফেলতে পারেন মেজবউদি। ধ্রুব বাড়িতে না থাকলে কোনদিন এই বাড়িতে বিনীতা এসেছে ব'লে মনে পড়ে না। যদিও বা কোন দিন ভুল ক'রে এসে পড়েছে, তবে তখুনি চলে গিয়েছে, আর যাবার আগে শুধু জেনে গিয়েছে, ধ্রুব কবে ফিরবে।

আজ আরও স্পষ্ট ক'রে জানা গেল যে, বিনীতার ঐ সব আবোল-তাবোল মুখরতার মধ্যে বড় বেশি অর্থ আছে, বড় বেশি দুঃসাহস আর আশা।

মেজবউদি বলেন—শুনলেন তো ভাই, নিজের কানে শুনে এইবার বিশ্বাস করুন।

ধ্রুব হাসে—ওর কথায় কি আসে যায়? ওর কথাতেই কি ভাল মেয়ে মন্দ মেয়ে হয়ে যাবে? আর আমিও কি ওর কথা বিশ্বাস ক'রে বসে আছি?

সুন্দর কথার জাল ছড়িয়ে এই ঝকঝকে বাড়ির মনের উপর একটা মায়া ছড়াবার চেষ্টা ক'রে চলে গেল বিনীতা। যেন ঐ সব কথার মায়ায় পড়ে মেয়ে পছন্দ করতে না পারে এই বাড়ির চক্ষু আর মন। ধ্রুব'র দুই চক্ষুর পছন্দকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে দিতে পারলে নিজের মনের একটা স্বপ্ন সত্য হতে পারবে, কত বড় দুরাশা দিয়ে বৃথাই নিজের মনটাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে রেখেছে বিনীতা!

শোভা বলে—সত্যিই বিনীতার জন্য দুঃখ হয়। বুদ্ধি থাকলে এরকম ভুল করতো না।

মেজবউদি বলেন—ওর বুদ্ধির কোন অভাব তো দেখছি না। কিন্তু ভুল বুদ্ধি।

শোভা—শুনেছিলাম, বিনীতার বিয়ের জন্য রাইবাবু খুব চেষ্টা করছেন।

মেজবউদি—করছেন তো, কিন্তু সেই একই সমস্যা, টাকার অভাবের জন্য এক একটা ভাল সম্বন্ধ ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে।

ধ্রুব হঠাৎ বলে ওঠে—আমরা কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করলেই তো পারি।

মেজবউদি—তা রাইবাবু যদি এসে ওঁকে ধরেন, তবে কিছু সাহায্য তো করবেনই উনি।

কথা শেষ ক'রে ধ্রুব'র মুখের দিকে তাকিয়ে মেজবউদি বলেন—বিনীতার ওপর তোমার হঠাৎ এরকম সিমপ্যাথি তো ভাল নয় ভাই।

কি আশ্চর্য, প্ল্যানিং কমিশনের দপ্তরে বসে যিনি একেবারে অঙ্কে অঙ্কে মিল ঘটিয়ে আর হিসেব ক'রে বুঝিয়ে দেবেন, কি ভাবে আর কোন্ হারে কারখানায় কাজ বাড়িয়ে তুলতে পারলে বিশ লক্ষ সাড়ে এগার হাজার টন অমুক সামগ্রী অমুক বছরের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে, তিনিই তাঁর বিয়ের দিনক্ষণ আর ব্যবস্থার প্ল্যানিং নিয়ে বেশ একটু হিসাবের গোলমালে পড়ে গেলেন! মেজবউদিকে ডাক দিয়ে বলেই ফেললো ধ্রুব—এখুনি বিয়ের কথা পাকাপাকি ক'রে ফেল না মেজবউদি। খুব তাড়াহুড়ো করবার দরকার নেই।

মেজবউদি—ওই মেয়েকে পছন্দ হয়েছে তো?

ধ্রুব—হয়েছে বৈকি।

মেজবউদি—আর সম্বন্ধের খোঁজ করবো নাকি বল?

ধ্রুব হাসে—তা খোঁজ করতে দোষ কি? ভালর চেয়েও ভাল কি আর হয় না?

সম্বন্ধের খোঁজ হয়, খোঁজ পাওয়া যায় এবং মেজবউদি আবার মেয়ের ফটোর ভিড়ের মধ্যে পড়ে ভাল মেয়ের আর সুন্দর মেয়ের মুখ বাছতে বাছতে দিশেহারা হয়ে যান।

শোভা বলে—এই তো একটি আরও ভাল মেয়ে বউদি। কী সুন্দর টানা টানা চোখ আর ঢল ঢল মুখখানি!

ঠিকই বলেছে শোভা। আগের মেয়েটির চেয়ে অনেক সুন্দর এই মেয়েটির মুখ। মেয়েটি যদিও গ্র্যাজুয়েট নয়, কিন্তু শিক্ষিতা মেয়ে বৈকি, বি-এ পরীক্ষাটা শুধু দিয়ে উঠতে পারেনি। তা ছাড়া কী সুন্দর ছবি আঁকতে পারে এলাহাবাদের অধ্যাপক বিনয়বাবুর এই মেয়েটি! বিনয়বাবুই চিঠিতে লিখেছেন, তাঁর মেয়ের হাতের আঁকা তিব্বতী স্টাইলের অনেকগুলি ছবি এই বছর বিদেশের টুরিষ্টরা কিনে নিয়ে গিয়েছে।

এলাহাবাদের মেয়ের ফটো ধ্রুব'র চোখের সামনে তুলে ধরেন মেজবউদি, এবং বিনয়বাবুর চিঠি পড়ে শোনাতেও থাকেন। ধ্রুব বলে—এই জন্যই তো তাড়াহুড়ো করতে বারণ করেছিলাম। ভাল মেয়ে পেতে হলে একটু দেরি করতে হয়।

মেজবউদি—শেষে এর চেয়েও ভাল মেয়ে দরকার হবে না তো?

ধ্রুব—আরে না মশাই না।

মেজবউদি—তাহলে বিনয়বাবুকেই পাকা কথা জানিয়ে দিই, কেমন?

ধ্রুব বলে—জানিয়ে দাও।

হঠাৎ বিনীতার আবির্ভাব। ঘরে ঢুকেই বিনীতা মেজবউদির হাত থেকে ফটো তুলে নিয়ে বলে—এইবার নিশ্চয় আরও ভাল মেয়ের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে।

মেজবউদি—হ্যাঁ, খোঁজ করলে নিশ্চয়ই যে পাওয়া যায় বিনীতা!

ফটোর উপর চোখ রেখে রেখে চেঁচিয়ে ওঠে বিনীতা—এই মেয়ে বাস্তবিক ভাল মেয়ে! দিব্যি মেয়ে, কিন্তু…।

ধ্রুব তার চোখের বিরক্তি আড়াল করার জন্যই চোখের কাছে বই তুলে পড়তে থাকে। মেজবউদি আস্তে একবার শোভার হাতে চিমটি কাটেন!

বিনীতা বলে—কিন্তু এই মেয়ে তো ধ্রুব'দার মত মানুষের চোখের কাছে আর মনের কাছে মানাবে না। না না না, এই মেয়ে চলবে না মেজবউদি। এই মেয়ের চোখ বড় বেশি টানা-টানা, এই মেয়ের মুখ বড় বেশি ঢল ঢল। আমার খুব সন্দেহ হয় শোভা, এই মেয়ে ধ্রুবদার চোখের সামনে বসে শুধু আকাশের মেঘের ছবি আঁকবে, আর দেখতেও পাবে না যে, হঠাৎ বাতাসের ফুরফুরানিতে বেচারা ধ্রুবদার কপালের উপর ঢেউ-খেলানো চুলগুলি নেমে পড়েছে।

শোভা একটু শক্ত ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে—তাতে কি হয়েছে কি?

বিনীতা হেসে হেসে লুটিয়ে পড়তে চায়।—না, এই মেয়ে নয়। ধ্রুবদার জন্য এমন মেয়ে চাই যে, দূরের ঐ ঘরের ভিতর থেকেই ঠিক দেখতে পাবে যে, তার বরের কপালের উপর ঢেউ-খেলানো চুলগুলি এলোমেলা হয়ে ফুরফুর করছে। সঙ্গে সঙ্গে সুড় সুড় ক'রে উঠবে সেই মেয়ের হাত! আর এক মুহূর্তও চুপ ক'রে বসে থাকতে পারবে না সেই মেয়ে; এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর ছুটে এসে ঘরের ভিতরে ঢুকেই বেশ মিষ্টি ক'রে হাত দুলিয়ে আর আঙ্গুল বুলিয়ে সেই ঢেউ-খেলানো চুল সরিয়ে দিয়ে বরের কপালের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

বিরক্ত হয়ে খটখটে শুকনো স্বরে মেজবউদি বলে ওঠেন—তারপর কি করবে? বরের সামনে ধেই ধেই ক'রে নাচবে?

বিনীতা—নাচবে বৈকি, কিন্তু কখন্ নাচবে জান? তোমাদের চোখের সামনে নয়। শ্রাবণ মাসের রাতে, যখন সারারাত ধরে বৃষ্টি পড়বে আর ঝড়ের শব্দ ছুটোছুটি করবে, সেই সময় ওপরতলার ঐ ঘরে, দু'পায়ে ছোট্ট দু'টি ঘুঙুর পরে রজনীগন্ধার শিষের মত আস্তে আস্তে শরীর দুলিয়ে একলাটি

বরের চোখের সামনে নেচে নেচে সারা হবে সেই মেয়ে। তুমি এই ঘরের ভেতর খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে ঝড়ের শব্দ শুনবে মেজবউদি; বরের মন-দোলানো সেই ঘুঙুরের শব্দ তুমি ছাই কিছু শুনতেও পাবে না।

শোভা বলে—থামলে কেন, হাঁপাচ্ছ কেন বিনীতা?

মেজবউদি—এমন মজার কথা বলতে গিয়ে আবার গম্ভীর হয়ে পড়ছো কেন বিনীতা?

ধ্রুব বলে—আর বলতে পারবে না বিনীতা, ওর কথার স্টক ফুরিয়ে গেছে।

বিনীতা ছটফট ক'রে হেসে ওঠে—অনেক রাতে চাঁদ উঠবে আকাশে, সে মেয়ে কিছুতেই ধ্রুবদাকে ঘরের ভেতরে থাকতে দেবে না। জোর ক'রে হাত ধরে টেনে ছাদের ওপর নিয়ে যাবে। তারপর, যেই না ধ্রুবদা চাঁদের দিকে তাকাবার জন্য চোখ তুলতে যাবে, অমনি সেই মেয়ে ধ্রুবদার···।

মেজবউদি বলেন—ধ্রুবদার গলা টিপে ধরবে বোধ হয়।

বিনীতা—না না না, মাই ডিয়ার মেজবউদি। অমনি সেই মেয়ে ধ্রুবদার গলা এক হাতে টেনে ধরে বলবে, আগে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নাও, তারপর চাঁদের দিকে তাকাবে।

শোভা—বসে পড়লে কেন বিনীতা? বলে যাও, বলে যাও, বেশ জমিয়ে কথা বলতে পারছো বিনীতা? এরই মধ্যে ফুরিয়ে যেও না।

ঠিকই, বসে পড়েছিল বিনীতা। এত উচ্ছল মুখরতার স্রোতে যেন তার মনের ভিতরে কতগুলি এলোমেলো শক্ত পাথরের বাধায় ফাঁপরে পড়েছে। উঠে দাঁড়ায় বিনীতা। চলে যাবার জন্য পা বাড়ায়। আচমকা এক ঝলক কৌতুকের ফোয়ারার মত হেসে ওঠেন মেজবউদি আর শোভা। এবং সেই হাসি যেন তাড়া দিয়ে বিনীতাকে ঘরের ভিতর থেকে বাইরের বারান্দায়, তারপরে সিঁড়িতে, তারপর একেবারে বাইরের পথের উপর নামিয়ে দেয়। চলে যায় বিনীতা।

এই রকমই একটা খেলা রোজই জমে ওঠে ঝকঝকে এই বাড়ির সুন্দর ক'রে সাজানো একটি ঘরের নিভৃতে। কখনো সকালে, কখনো বা সন্ধ্যায়। বিনীতা মল্লিকের মুখরতা এই ঘরের মুখখোলা হাসির ঠাট্টায় আর কৌতুকে, অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি তীক্ষ্ণ এক একটি তুচ্ছতার তাড়ায় এই ভাবেই ক্লান্ত হয়ে চলে যায়। কি সাধ্যি আছে বিনীতার, এই বাড়ির মনের ইচ্ছাকে তার এইসব আবোল-তাবোল রং-মাখানো কথায় মোহ দিয়ে মিথ্যা করে

দিতে পারে? বরং মেজবউদি শোভা আর ধ্রুবজ্যোতির রং-মাখানো বিদ্রূপগুলি যেন বিনীতাকে খেলিয়ে খেলিয়ে, হাঁপ ধরিয়ে দিয়ে আর জব্দ ক'রে ছেড়ে দেয়। এ বড় কঠিন ঠাঁই।

ধ্রুবজ্যোতি যেন আবার একদিন মেজবউদিকে ডেকে প্রশ্ন করে হঠাৎ—এলাহাবাদের বিনয়বাবুকে কি পাকাপাকি কিছু জানিয়ে দেওয়া হয়েছে?

মেজবউদি—না, এখানো জানানো হয়নি।

ধ্রুব—একটু ভেবে নিয়ো বউদি, ঝট ক'রে নয়, একটু দেরি ক'রে চিঠির উত্তর দিও।

মেজবউদি—কেন? আবার কি হলো?

ধ্রুব—কি হবে আবার? সবই ঠিক আছে।

মেজবউদি—ঠিক ক'রে বল ভাই, যদি বিনয়বাবুর মেয়েকে তেমন পছন্দ না হয়ে থাকে তবে আর একটি মেয়ের ফটো দেখতে পার।

ধ্রুব—দেখাও তাহলে।

আর একটি ফটো নিয়ে এসে মেজবউদি বলেন—এই ফটো কাল এসেছে। এই মেয়ে প্রায় তোমার মতই স্কলার। হিষ্ট্রিতে রিসার্চ করছে। মেয়ের বাবা লিখেছেন, ডক্টরেট পাবেই পাবে তাঁর এই একমাত্র মেয়ে। আমি আর শোভা এতক্ষণ এই কথাই বলাবলি করছিলাম।

ধ্রুব—কি কথা?

মেজবউদি—এই মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হলে ভাল হয়।

ফটোর দিকে তাকিয়ে খুশি হয়ে ওঠে ধ্রুবজ্যোতির চোখ। এবং হঠাৎ একটু লজ্জিত হয়ে বলে—চেহারাও তো বেশ ভালই দেখছি, কিন্তু এই মেয়ে কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?

শোভা রাগ ক'রে চেঁচিয়ে ওঠে—হঠাৎ তোমার মনে এত তৃণাদপি বিনয় দেখা দিল কেন রাঙাদা?

ধ্রুব হাসে—একটু বেশি পছন্দ হয়ে গেলে মনে একটু বিনয় টিনয় না হয়ে তো পারে না।

হঠাৎ দরজার পর্দা সরে যায়। এক টুকরো ঝড়ো হাওয়ার মত যেন লাফালাফি করতে করতে ঘরের ভিতরে ঢুকেই বিনীতা মল্লিক বলে—নতুন ফটো এসেছে বুঝি?

আবার এসেছে বিনীতা। মেজবউদি আর শোভা সত্যিই আশ্চর্য না

হয়ে পারে না। ওর এই দুঃসাহস বোধ হয় সেইদিন ফুরিয়ে যাবে, যেদিন সত্যিই ধ্রুবজ্যোতির বিয়ে হয়ে যাবে। ততদিন পর্যন্ত এই ঝকঝকে বাড়ির ভিতরে এসে কথার মালা দুলিয়ে মায়া ছড়াবার খেলা বন্ধ করতে পারবে না বিনীতা। বোধ হয় সত্যিই বিশ্বাস করেছে বিনীতা, ওর ঐ সব রং মাখনো কথার শব্দ শুনে ধ্রুবজ্যোতি সেনের মত মানুষের মনের পছন্দও রং বদল ক'রে ফেলছে। মনে মনে বোধ হয় খুশি হয়েছে বিনীতা, ধ্রুবর বিয়ের জন্য এই বাড়ির এক একটি পাকাপাকি ইচ্ছার অদৃষ্ট বার বার ভেঙ্গে যাচ্ছে ওরই ঐ রং মাখানো কথাগুলির জন্য। এই বিশ্বাস নিয়েই রাইবাবুর মেয়ে বিনীতার মনের আশা দুঃসাহসী হয়ে থাকুক। এই ঝকঝকে বাড়িও ওকে শুধু খেলিয়ে খেলিয়ে আর হাঁপ ধরিয়ে ছেড়ে দেবে, যতদিন না এই বাড়িতে ঐ আশা নিয়ে আসবার সাহস ছেড়ে দেয়।

আবার জমে উঠুক খেলা। মনে মনে শক্ত হাসি হেসে প্রস্তুত হন মেজবউদি আর শোভা। অপলক চোখ নিয়ে ফটো দেখছে বিনীতা। দেখুক, এই বাড়ির চোখগুলিও দেখবে বিনীতা আজ কোন্ রঙের আর কোন্ গন্ধের ফুল দিয়ে তার কথার মালা রচনা করে।

খেলা দেখবার জন্য তৈরী হয় ঝকঝকে বাড়ির তিনটি মানুষের কৌতুক-সুখী চক্ষু। হাততালি দিয়ে নীরবে পাগলা ঘোড়াকে আরও জোরে ছুটিয়ে দেবার মত এক কৌতুকের হাততালি নীরবে বাজতে থাকে এই ঝকঝকে বাড়ির মনের ইচ্ছার গভীরে।

—বেশ মেয়ে, খুব ভাল মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। ফটোর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বিড় বিড় ক'রে বলতে থাকে বিনীতা। তারপর ধ্রুবজ্যোতির মুখের দিকে তাকিয়েই মুখ টিপে হেসে ফেলে বিনীতা—এই মেয়েকে ধ্রুবদার সঙ্গে খুব ভাল মানাবে। কোন সন্দেহ নেই মেজবউদি।

একি! ঝকঝকে বাড়ির প্রাণের এত প্রিয় এক কৌতুকের আশাগুলিকে যেন হঠাৎ ঠকিয়ে দিল বিনীতা। মেজবউদি আর শোভার গলার ভিতরে তৈরী হাসিগুলি যেন হঠাৎ ঝাঁপরে পড়ে। বিনীতার চোখের চঞ্চলতায় সেই দুঃসাহসের ছায়া কই? বিনীতার মুখরতা সেই দুরাশার কলরবের শত রং মাখানো কথার ফোয়ারা ছড়ায় না কেন? তা না হলে খেলা জমবে কেমন ক'রে?

কথামালা কিন্তু ঠিকই কথা বলে যায়। —এবার পূজার সময় বেড়াতে যাব বলে মনের আহ্লাদে অনেক স্বপ্ন দেখছি মেজবউদি। বাবা বলেছেন,

পুরী গেলে ভাল হয়, দু'বেলা সমুদ্রে স্নান করা যাবে। আমি বলেছি, রাখ তোমার সমুদ্র। সমুদ্রের চেয়ে হিমালয় ঢের ঢের ভাল, পুরীর চেয়ে দার্জিলিং ভাল।

সবচেয়ে বেশ অদ্ভুত দেখায় ধ্রুবজ্যোতির চোখ দুটোকে। যেন হঠাৎ দীপ নিভে গিয়েছে, তাই হঠাৎ জ্যোতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ধ্রুবজ্যোতির দু' চোখের দৃষ্টি।

ইতিহাসের স্কলার, শিগগিরই ডক্টরেট পাবে, বেশ ভাল ও দেখতে সুন্দর একটি মেয়েকে যেন হঠাৎ হাত ধরে একটান দিয়ে ধ্রুবর চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে হাল্‌কা হয়ে আর মুক্ত হয়ে আলগোছে দূরে সরে গিয়েছে বিনীতা।

কিন্তু কি দরকার ছিল? এই সব অনধিকার চর্চার মধ্যে আসে কেন বিনীতা? এই মেয়ে ওর মনের দুরাশার ভুলে ধ্রুব'র চোখের পছন্দকে শুধু বার বার বাধা দেবে, মেয়ের ফটো দেখে মনে মনে হিংসে করবে, আর কথার রং ছড়িয়ে চলে যাবে।

কথা বলছে বিনীতা, কিন্তু কী বাজে কথা! কথার মালা নয়, কথার ধুলো যেন। এ সব কথা শোনবার জন্য কোন লোভ নেই ধ্রুবজ্যোতির কানে।

জোর ক'রে হাসতে চেষ্টা করে ধ্রুব। তুমি যে একেবারে ভুগোলের পড়া পড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে বিনীতা, যত সব পাহাড় সমুদ্দুর আর···।

ভুগোল ছেড়ে দিয়ে সেলাই-এর তত্ত্ব নিয়ে মুখরতা করে বিনীতা।
—হাত বটে সুব্রতার। আপনি বোধ হয় দেখেননি মেজবউদি, একটা কাঁথা তৈরী ক'রেছে সুব্রতা, কিন্তু কে বলবে ওটা একটা কাঁথা? দেখে মনে হয় একটা কাশ্মীরী শাল।

না, বিনীতাকে যেন সত্যিই এক বধিরতার ভুলে পেয়েছে। নইলে শুনতে পেত বিনীতা, ধ্রুবজ্যোতির ঐ অভিযোগের মধ্যে কিসের এক দুরন্ত আগ্রহ হঠাৎ আশাভঙ্গের বেদনায় আর্তনাদ ক'রে উঠেছে। ঐ রং-মাখানো আবোল-তাবোল কথাগুলি, যে কথাগুলিকে এত সহজে আর এত সস্তা করে এই বাড়ির প্রাণের উপর এতদিন ধরে ছড়িয়ে দিয়ে এসেছে বিনীতা, সেই কথাগুলি হঠাৎ এমন দুর্লভ হয়ে যাবে কেন?

বিনীতার মুখরতা হঠাৎ ফুরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার জন্য কেন একটা শূন্যতার মধ্যে পড়ে ছটফট করে ধ্রুবজ্যোতির মন? বুকে জড়িয়ে ধরে রাখা

জিনিষ হঠাৎ সরিয়ে নিলে যেমন চমকে উঠতে হয়, বিনীতার মুখরতাগুলি যেন ঠিক তেমনি হঠাৎ এক নিষ্ঠুরতার খেয়ালে আলগা ক'রে ছেড়ে দিয়েছে ধ্রুবজ্যোতির মনটাকেই। নইলে……নইলে এরকম অস্বস্তি বোধ করবে কেন ধ্রুব?

বিকেলের কাক কলরব করে ঝকঝকে বাড়ির বাগানে পামের মাথার উপর বসে। মেজবউদি বলেন—আমি এখন চা খাব।

শোভা বলে—আমিও।

বিনীতা বলে—আমিও যাই, অনুরাধাকে একটু জ্বালিয়ে আসি।

চলে যান মেজবউদি, চলে যায় শোভা। বিনীতা চলে যেতে গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। শুনতে পেয়েছে বিনীতা, হঠাৎ কি যেন বলে উঠছে ধ্রুব।

বিনীতা—কি বললেন ধ্রুবদা?

মুখ বড় বেশি গম্ভীর করেও ধ্রুব যেন হাসতে চেষ্টা করে। —এতক্ষণ এখানেই তো বেশ জ্বালাচ্ছিলে, হঠাৎ অনুরাধাকে জ্বালাবার শখ হলো কেন?

খলখল ক'রে হেসে হেসে দুলতে থাকে বিনীতা—কিন্তু আর জ্বালাবো কেমন ক'রে? মেজবউদি পালিয়ে গেলেন, শোভাও সরে পড়লো।

ধ্রুব বলে—আমি তো আছি, সরেও পড়িনি।

বিনীতার মুখরতা যেন হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে যায়। —আপনাকে কিন্তু আমি সত্যিই কোনদিন জ্বালাতে চেষ্টা করিনি।

ধ্রুব হাসে—তাহ'লে বসো, এখুনি চলে যেও না।

—সে কি! যেন নিজের মনেই বলে ফেলছে বিনীতা। দু' চোখে চমকে উঠেছে অদ্ভুত এক ভীরু ভীরু বিস্ময়। ঝকঝকে বাড়ির হাসিভরা মুখে কোনদিন যে অনুরোধ ধ্বনিত হয়নি, সেই অনুরোধ আজ হঠাৎ এইভাবে, এই বিকেলের আলোতে, এই একা ঘরের নিভৃতে বিনীতাকে প্রথম বাধা দিয়ে এ কি কথা বলছে? এখুনি চলে যেও না!

ধ্রুব বলে—আশ্চর্য হয়ে গেলে কেন বিনীতা? কি এমন অদ্ভুত কথা বলেছি?

বিনীতা হাসে—আশ্চর্য হইনি, খুব সন্দেহ করছি ধ্রুবদা, আপনি নিশ্চয় আমাকে একটা অদ্ভুত কথা জিজ্ঞাসা করবেন। আপনি নিশ্চয়ই কিছু শুনতে পেয়েছেন।

ধ্রুব বিব্রতভাবে তাকায়—কি শুনতে পেয়েছি?

মুখের উপর আঁচল চাপা দিয়ে যেন একটা নতুন হাসির কল্লোল চাপা দিতে চেষ্টা করে বিনীতা। ধ্রুব বলে কি হলো?

বিনীতা—আপনি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন যে আমি আর আপনাদের আলাতে আসতে পারবো না।

ধ্রুব—না, আমি স্বপ্নেও কথনো ভাবতে পারিনি যে তুমি আসবে না!

বিনীতা—রাইচরণ মল্লিকের মেয়ের যে বিয়ের দিনক্ষণ পর্যন্ত…।

ধ্রুবজ্যোতি সেনের চক্ষু হঠাৎ আবার জ্যোতি হারিয়ে যেন অন্ধের মত তাকিয়ে থাকে।

বিনীতা—আজই সন্ধ্যায় আশীর্বাদ করতে আসবে।

ধ্রুবজ্যোতি জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে আর হাসে—তাই বল!

চেয়ারের উপর চুপ ক'রে বসে হাতের বই-এর পাতার দিকে তাকিয়ে রাশি রাশি অঙ্কের ভিড় দেখতে থাকে ধ্রুব। বিনীতা আর এক চেয়ারের উপর বসে নিজের মুখরতার আবেগে কত কথা ছড়াচ্ছে, তার একটা শব্দও যেন কানে শুনতে পাচ্ছে না ধ্রুব। কি হবে শুনে? ওসব কথা কোন কথাই নয়; যেন শুকনো ধুলোর মত কতগুলি বাজে কথার একটা আঁধি মাতামাতি করছে। বিনীতার রঙীন কথার মালা এখন ওর স্বপ্নের মধ্যে দুলছে, পৃথিবীর একটি মানুষের গলা জড়িয়ে ধরবার জন্য। আজই সন্ধ্যায় এসে আশীর্বাদ ক'রে এই বাড়ির পিছনের ঐ সদর রাস্তার কিনারায় একটি পুরনো বাড়ির বুক হাতড়ে এক আবোল-তাবোল মনের মেয়েকে লুফে নিয়ে চলে যাবে। আজই সন্ধ্যায় তাঁতের শাড়ি পরবে আর কপালে খয়েরের টিপ আঁকবে বিনীতা।

কি হবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে? বিনীতার মুখের দিকে তাকাতে পারে না ধ্রুব। অনেক রাতে যখন চাঁদ উঠবে আকাশে, তখন ঐ মুখই তো একটি মানুষের চাঁদ দেখার বাধা হয়ে উঠবে। যেমন মেজবউদির, তেমনি শোভার, আর তেমনি ধ্রুবর নিজেরও চোখ দু'টো এতদিন ধরে মূর্খের মত শুধু ভুল বুঝেছে বিনীতাকে। এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করতে পারেনি যে ঐ মেয়ে প্ল্যান ক'রে এই বাড়ির সব হাসির অহংকারকে ঠকিয়ে দেবার জন্যই এতদিন এখানে এসেছে।

সহ্য করতে কষ্ট হয়, তাই বোধ হয় হঠাৎ চেঁচিয়ে হেসে ওঠে ধ্রুব। —এবার তাহলে ছোট ছোট ঘুঙুর যোগাড় ক'রে ফেল বিনীতা।

বিনীতা আশ্চর্য হয়ে হাসে—ঘুঙুর? ঘুঙুর দিয়ে আমি কি করবো ধ্রুবদা? বরের সামনে ধেই ধেই করে নাচবো?

ধ্রুব—কেন, শ্রাবণ মাসে কোন ঝড়ের রাত কি পাওয়া যাবে না? একলাটি বরের চোখের সামনে রজনীগন্ধার শিষের মত দুলে দুলে…।

হাসিমুখর বিনীতার দু' চোখে হঠাৎ যেন ব্যথার্ত বিস্ময় চমকে ওঠে। —আপনি আমাকে বুঝতে খুবই ভুল করছেন ধ্রুবদা। আমার ওসব কোন সাধ্যিই নেই।

ধ্রুব'র দু' চোখ হঠাৎ দপ ক'রে ওঠে—তবে তুমি এতদিন ধরে এত কথায় রং ছড়িয়ে আমাকে কি বোঝাতে চেয়েছিলে?

ভয় পায় বিনীতা—আমি আপনাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করিনি ধ্রুবদা। বিশ্বাস করুন। ইচ্ছা ক'রে, কোন ইচ্ছা নিয়ে আমি ওসব কথা বলিনি। ওসব কথা আমার স্বপ্নেও আবোল-তাবোল গানের মত কতগুলি আবোল-তাবোল সাধের চিৎকার মাত্র। বলতে ভাল লাগে, সেই জন্যই বলি।

ধ্রুব—তাহলে তুমি কি?

বিনীতার মনের ভয়টাও যেন চেঁচিয়ে উঠতে চায়:—আমি একেবারে একটা অচল সিকি ছাড়া আর কিছু নই ধ্রুবদা। আমি ওসব কিছুই করতে জানি না, আমি ওসব কিছুই বলতে পারি না।

ধ্রুব—বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বিনীতা—বিশ্বাস করুন, আর আমাকে এইবার যেতে বলুন।

চুপ ক'রে বিনীতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ধ্রুব। এই মেয়েকে অবিশ্বাস করতেই ভাল লাগছে আজ। ওর একটি কথা বিশ্বাস ক'রে ওকে চলে যেতে দিলে যেন চিরকালের মত ঠকে যাবে ধ্রুবজ্যোতি সেনের জীবন। ধ্রুব'র মনটা যেন তাই কঠিন প্রতিজ্ঞার দুই বাহু বিস্তার ক'রে পথ আটক ক'রে ধরে রাখতে চাইছে সেই মেয়েকে, যে মেয়ে শুধু একটা ফটোকে তার চোখের সামনে ঠেলে দিয়ে কল্পলোকের মধুরতাগুলিকে নিজের আঁচলে বেঁধে সরে পড়বার চেষ্টা করছে।

ধ্রুব হাসতে হাসতে বলে—অনেক রাতে চাঁদ উঠবে যখন আকাশে, তখন ছাদের ওপর একলা বরের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তুমিই তো অনায়াসে সেই রং মাখানো কথা বলতে পারো…।

বিনীতা যেন দুই হাতে চোখ ঢাকতে চায়। মাথা হেঁট ক'রে ক'রে মুখ লুকিয়ে যেন ফুঁপিয়ে ওঠে রাইচরণ মল্লিকের মেয়ে।—না না না, আমি ওকথা বলতে পারি না। আমি তাকে শুধু বলতে পারি, কখ্খনো ভুল ক'রে এই মেয়ের মুখের দিকে তাকিও না, তা হলেই ঠকবে, শুধু চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাক।

চেয়ার থেকে উঠে আস্তে আস্তে হেঁটে বিনীতার সামনে এসে দাঁড়ায়

ধ্রুব। হেসে হেসে বলে—এ তো আরও বেশি রং-মাখানো কথা হয়ে গেল বিনীতা।

ঝকঝকে বাড়ির বাগানে পামের উপর বসে আর কলরব করে না কোন কাক। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। চেয়ার ছেড়ে ছটফট ক'রে উঠে দাঁড়ায় বিনীতা। আর, এই বাড়ির হাসির কৌতুকটাকে শেষবারের মত ভয় ক'রে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে বিনীতার মন। চলে যাবার জন্যই পা বাড়িয়ে এগিয়ে যায় বিনীতা।

ধ্রুব—একটা কথা জেনে যাও বিনীতা।

বিনীতা—বলুন।

ধ্রুব—তুমি অনেকবার আমার বিয়ে ভেঙ্গেছ, কিন্তু আমিও যে তোমার বিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারি।

বিনীতা—তা'তে আপনার লাভ ?

ধ্রুব—তাহলে শোন।

বিনীতার একেবারে চোখের কাছেই এসে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় ধ্রুবজ্যোতি সেন।

চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বাইরের ঘরের দরজার পর্দা ঠেলবার আগে হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন মেজবউদি। এ কি! কথামালা যে এখনও আছে, এখনও এই ঘরের ভিতর বসে আবোল-তাবোল কথা ছড়াচ্ছে।

—না না না, আপনি সত্যিই ঠকবেন। পৃথিবীতে এত ভাল মেয়ে থাকতে আপনি কেন ভুল ক'রে…মিছিমিছি…আপনার মত মানুষ কেন আঃ।

নীরব হয়ে গেল কেন কথামালা ? কথা বলে না কেন বিনীতা ? দরজার পর্দা আস্তে সরিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি দিতেই চমকে সরে আসেন মেজবউদি।

ঠিকই তো! কথা বলবে কেমন ক'রে মেয়েটা ? ওভাবে মুখ বন্ধ করে দিলে কোন মেয়েই কথা বলতে পারে না।

আগেই খবর দিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং ট্যাক্সিটাও ঠিক সময়েই এসে বাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ন বাজিয়ে ডাক দিল।

আর দেরি করবার কোন কারণ নেই। চলে যাবার জন্যই তৈরী হয়ে এতক্ষণ চুপ ক'রে বসেছিল হেমেন। এখন শুধু গরম আলোয়ানটা তুলে নিয়ে কাঁধের উপর ফেলতে হবে, আর ঐ ছোট ব্যাগটা হাতে তুলে নিতে হবে। তারপর ঘরের এই দরজা এইভাবেই খোলা রেখে এবং পিছনের দিকে আর এক মুহূর্তের জন্যও না তাকিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে ট্যাক্সির ভিতরে ঢুকে পড়তে হবে। উধাও হয়ে যাবে ট্যাক্সি, সঙ্গে সঙ্গে হেমেনের জীবনটাও সাত বছরের একটা অভিশাপের বন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে এক মুক্তির পথে উধাও হয়ে যাবে।

কাঁটায় কাঁটায় রাত দশটা। আসতে একটুও দেরি করেনি ট্যাক্সি। এবং সারা বাড়িও একেবারে স্তব্ধ হয়ে হেমেনের মুক্তির এক সুন্দর লগ্ন ঘনিয়ে রেখেছে।

সুরীতি এখনো বাড়িতে ফেরেনি। হেমেনের সঙ্গে প্রিয় সম্পর্কের বাঁধনে বাঁধা হয়ে থাকা উচিত ছিল যার, সেই মানুষ এই বাড়িতেই থাকে, ঐ সুরীতি, হেমেনের স্ত্রী, কিন্তু সে এখন লালবাগের কোন একটি বাড়ির একটি মানুষের দু'চোখ ছাপিয়ে উথলে পড়া এক হাসির উৎসবের কাছে বাঁধা পড়ে বসে আছে।

আর কে আছে এই বাড়িতে? রান্নাবান্না করে যে পাঁড়েজী, আর জল তোলে ও বাসন মাজে যে জানকীরাম, তারাও এখন ভাং খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে এই বাড়ির কোন একটি ঘরের দুই কোণে। কাজেই হেমেনের এই মুক্তিযাত্রার শুভ মুহূর্তে পিছন থেকে একটা হাঁচিকাশি দিয়েও বাধা দেবার মত মানুষ কেউ আর নেই।

হ্যাঁ, আর একটা মানুষ আছে। কিন্তু তার সঙ্গে হেমেনের জীবনের কোন প্রিয় সম্পর্কের বন্ধন নেই। সে হলো সুরীতির মেয়ে ইমা, প্রায় অপোগণ্ড একটা সাত বছর বয়সের মানুষ। সে তো এখন তার মায়ের দেওয়া নতুন উপহার সেই রঙীন সিল্কের ফ্রক প'রে আর জুতো-মোজা পরানো পা দিয়ে বিছানার উপর পড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

তা ছাড়া, ও মেয়েটা জেগে থাকলেই বা কি? এইটুকু বয়সের ঐ মেয়ে যদি এখন জেগেও থাকে, তবে দূর থেকে আড়ালে দাঁড়িয়ে শুধু দু'চোখের চোরা দৃষ্টি ভাসিয়ে দেখতে থাকবে। কাছে ছুটে আসবে না, কিংবা দূর থেকে একটা ডাকও দেবে না। ঐ মেয়েই তো সেই দুঃসহ রহস্য, যার জন্য সাত বছর ধরে অশান্ত হয়ে রয়েছে হেমেনের মন। লোকে সে রহস্যের কোন খোঁজ খবর রাখে না বলেই ভুল ক'রে বলে যে, হেমেন বাবুর মেয়ে ইমা সত্যিই বড় ভাল মেয়ে।

লোকে জানে, ইমা হলো হেমেন বাবুর মেয়ে। লোকে জানে সুরীতি হলো হেমেন বাবুর স্ত্রী। লোকের এই দুই ধারণাই আইনত সত্য, কিন্তু জীবনের সত্য নয়। তা না হ'লে আজ এই রাত দশটার নীরবতার মধ্যে একটা ট্যাক্সি এসে হেমেনের জীবনটাকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্য হর্ন বাজাতো না।

ব্যাগ হাতে তুলে নেয় হেমেন, এবং গরম আলোয়ানটাকেও কাঁধের উপর ফেলে। এবং দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। কি আশ্চর্য, এ যে সুরীতির সেই মেয়েটা। দরজার মাঝখানে পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে রঙীন সিল্কের ফ্রকপরানো ইমা।

কোনদিন কোন ভুলেও মেয়েটা হেমেনের ছায়ার কাছেও এসে দাঁড়ায় না। চিরকাল দূরে দাঁড়িয়েই শুধু চোরা চাউনি তুলে হেমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে এসেছে যে মেয়ে, সেই মেয়ে হঠাৎ এত বড় সাহস পেয়ে গেল কেমন ক'রে? কি বলতে চায়, কেন এসেছে ইমা? এতক্ষণ না ঘুমিয়ে জেগেই বা আছে কেন? কি-ই বা কতটুকুই বা বুঝতে পেরেছ ইমা?

হেমেন বলে—তুমি হঠাৎ এখানে ছুটে এলে কেন ইমা?

ইমা ক্যাল-ক্যাল ক'রে তাকিয়ে আর অদ্ভুত রকমের ভীতু গলার স্বর কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে প্রশ্ন করে—তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ বাবা?

মুখ ফিরিয়ে ঘরের দেয়ালের দিকে তাকায় হেমেন। বাবা! ইমার মুখের এই ডাকের মধ্যে যে ভয়ংকর এক বিদ্রূপ লুকিয়ে রয়েছে! বাইরের কতকগুলি আইনের জোরে ইমা ঐ ডাক ডাকতে পারে, কিন্তু জীবনের কোন দাবীর জোরে নয়। সুরীতি তার মেয়েকে কতরকম রীতি-নীতি শেখালো, কিন্তু ইমার মুখের এই বিদ্রূপের ধ্বনিটাকে নিষিদ্ধ ক'রে দিল না কেন? সাত বছর বয়স হয়েছে মেয়ের, এখন তো তাকে বেশ শেখাতে পারা যায়। সুরীতি কি জানে না যে, এই সাত বছরের মধ্যে ইমাকে একবার স্পর্শও করেনি হেমেন?

হেমেন বলে—তুমি কি ক'রে বুঝলে যে আমি চলে যাচ্ছি?

ইমা—ট্যাক্সি এসেছে, তুমি ব্যাগ হাতে নিয়েছ।

হেমেন—তুমি এখন ঘরে যাও।

ইমা—তুমি ঘরে থাকবে তো?

হেমেনের চোখ জ্বলে ওঠে—কেন ঘরে থাকবো আমি?

ইমা—তুমি আর রাগ ক'রো না বাবা।

হেমেন আবার দেয়ালের দিকে তাকায়—কেন?

ইমা বলে—আমি তোমাকে খাবার জল এনে দেব। আমি তোমার বিছানা ক'রে দেব।

হেমেনের হাতের ব্যাগ হঠাৎ কেঁপে ওঠে। মনের কঠোর জ্বালাটাও যেন হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়। একটু আশ্চর্য না হয়েও পারে না, এবং ভাবতে গিয়ে হেসেই ফেলে হেমেন। এই মেয়ের চোরা-চাউনি কি সত্যাই এত সজাগ? হেমেনের জীবনের খুঁটিনাটি দুঃখ আর দীর্ঘশ্বাসগুলিকে কেমন ক'রে দেখতে পায় এবং কখন দেখতে পায় এই মেয়েটা?

অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে নিজের হাতেই জল গড়িয়ে খায় হেমেন। রাত দশটার সময় আধ-ঘুমে আচ্ছন্ন চক্ষু নিয়ে টলতে টলতে নিজের হাতেই নিজের বিছানা করে হেমেন। এই ছোট ছোট দুঃখগুলি যে হেমেনের জীবনের সেই আসল অশান্তির দান, এবং সেই অশান্তির রহস্য থেকেই জন্মলাভ করেছে রঙীন সিল্কের ফ্রক-পরানো এই মেয়ে, এই ইমা। এই ইমা পৃথিবীতে দেখা না দিলে আজ নিজের হাতে জল গড়িতে খাওয়ার দুঃখকে জীবনের একটা অস্বস্তি মনে ক'রে হয়তো শুধু রাগ করতো হেমেন, কিন্তু এত অভিশপ্ত আর অশান্ত হয়ে উঠতো না হেমেনের জীবন।

কা'র মেয়ে ইমা? হেমেনের মনের এই প্রশ্নের সন্ধান এই সাত বছরের মধ্যেও কোন উত্তরের নাগাল পায়নি। কিন্তু আজ পেয়েছে। যেন ইমার পিতৃপরিচয় জানবার লোভে সাত বছর ধরে অপেক্ষায় ছিল হেমেন। আজ জানতে পেরেছে হেমেন। এবং তাই তো এইবার সাত বছরের অশান্ত জীবনটাকে নিয়ে শূন্যে উধাও হয়ে যাবার জন্য ট্যাক্সি ডেকেছে হেমেন।

সাত বছর বয়সের ইমা'র মনের ভুল এখনি ভেঙ্গে দিতে পারা যায়। ইচ্ছা করলে অনায়াসে বলে দিতে পারে হেমেন, আর ক'দিন পরেই তো লালবাগের সেই ভদ্রলোকের আদরভরা কোলের উপর বসতে হবে, কাজেই আমার দুঃখের কথা নিয়ে তোমার ভাবনা করার দরকার হয় না। জীবনের

এই সত্য বুঝতে পারলে আমাকে আর বাড়িতে ধরে রাখবার জন্ত আধ-আধ ভাষায় এই অনুরোধ জানাতে না।

কিন্তু এসব কথা এই সাত বছর বয়সের একটা মেয়েকে বলবারই বা দরকার কি? এইটুকু মেয়ে ওর জীবনের সেই জটিল রহস্তের তত্ত্ব বুঝবেই বা কি? ইমা যেমন তার খেলনা ঘরের পুতুলগুলির দুঃখ দেখে দুঃখিত হয়, তেমনই হেমেনের মত প্রকাণ্ড একটা অপমানিত জীবনের পুতুলকেও সেইরকম দুঃখিত মনের সান্ত্বনা জানাচ্ছে।

আজকাল এই পাড়ার, রাঁচির এই ডোরাণ্ডার লোকেরা আড়ালে আড়ালে ফিসফাস করে, হেমেন বাবুর জীবনটা বড়ই অশান্তির জীবন, এবং তাই তো হেমেন বাবুর আর কোন ছেলেপিলে হলো না।

হেমেনের জীবনের অশান্তিটাকে দেখতে ভুল হয়নি কারও। চোখে দেখতে পাওয়া গেলে বুঝতেই বা ভুল হবে কেন? হেমেন আর সুরীতিকে এই সাত বছরের মধ্যে কোনদিন একসঙ্গে বেড়াতে যেতে দেখা যায় নি। অথচ হেমেন আর সুরীতি দু'জনেরই সারাদিনের মধ্যে অন্তত একটিবার বাইরে বেড়িয়ে আসা অভ্যাস। ঠিক যে সন্ধ্যায় হেমেনকে দেখা যায় মোরাবাদী পাহাড়ের কাছে, ঠিক সেই সন্ধ্যায় দেখা যায় রিক্সায় চড়ে সুরীতি লেকের পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়িয়ে ফিরছে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে সুরীতিকে বাড়ির মধ্যে ক'দিনই বা দেখতে পেয়েছে হেমেন? জানকীররাম শুধু খবর জানিয়ে দিয়েছে, মাইজি হিনু বেড়াতে গিয়েছেন।

অথচ এই ডোরাণ্ডার লোকেরাই সাত বছর আগে হেমেন আর সুরীতির বিয়ের সংবাদ শুনে আশ্চর্য হয়ে বলেছিল, অ্যাঁ—এ যে একেবারে বিশ্বজয়ী প্রেমের ঘটনা!

বড় অকস্মাৎ, শুধু দু'তিনটি দিনের দেখা-শোনার পরেই ডোরাণ্ডার হেমেন আর হিনুর সুরীতির বিয়ে হয়ে গেল। সুরীতির মত বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে হেমেনের মত সাধারণ লোকের বিয়ে হবার কথা নয়। শাস্ত্রবিশ্বাসী সন্তোষ বাবুর পক্ষেও কার্তিক মাসে, এবং তার উপর আবার আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করিয়ে মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু সময় সংস্কার শাস্ত্র ও লগ্নের কোন বাধাই বাধা হয়ে উঠতে পারলো না। বিয়ে হয়ে গেল।

পাত্রের চলতি বাজার দর অনুসারে হেমেনের মত পাত্র যত টাকা বরপণ পেতে পারে, সুরীতিকে বিয়ে ক'রে তার পাঁচগুণেরও বেশি বরপণ পেল হেমেন। এবং সন্তোষবাবু বিশেষ খুশি হয়ে তাঁর মেয়ে-জামাইকে দেড় বছরের

জন্য আলমোড়াতে গিয়ে মনের আনন্দে থাকবার জন্য আরও কয়েক হাজার টাকা খরচ করলেন।

বিশ্বজয়ী প্রেমের ঘটনা ব'লে মনে ক'রে যারা সেদিন আশ্চর্য হয়েছিল, আজ তারাই আড়ালে আড়ালে, এমন কি প্রকাশ্যেও বলে ফেলতে একটুও দ্বিধা করে না—আর বেশি দিন নয়, বাঁধন কাটলো বলে! হয় সেপারেশন নয় ডাইভোর্স। এইভাবে দাম্পত্য জীবন চলে না, চলতে পারে না।

চাকর জানকীরামের কাছ থেকেই পাড়ার লোক অনেক খবর জেনে আরও নিঃসন্দেহ হয়। বাবু আর মাইজীর মধ্যে মাসের মধ্যে একটা দিনও কথাবার্তা হয় কিনা সন্দেহ। যদিও বা হয়, সেগুলি কথাবার্তা নয়। ত্ব'জনের মধ্যে তীক্ষ্ণ তীব্র ও উন্মুক্ত কতগুলি কথার বিনিময়। অনেক দিনের নীরবতার পর হঠাৎ এক একদিন শুধু চার-পাঁচ মিনিটের জন্য তু'জনে তু'জনেরই মনের উপর যত ঘৃণা আর বিদ্বেষ ঢেলে নিজের নিজের কাজের অথবা ইচ্ছার দিকে চলে যায়।

বিয়ের পর পনরটা দিন যেতে না যেতে, আলমোড়াতে আনন্দ নিয়ে থাকবার সেই সময়েই হেমেনের অন্তরাত্মা যেন নিষ্ঠুর এক বঞ্চনার বিভীষিকাময় ছায়া দেখে চমকে উঠেছিল। হঠাৎ অসুস্থ হয়েছিল সুরীতি, এবং ডাক্তার ভদ্রলোক নিজেই হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠলেন, আমাকে ডেকে ভুল করেছেন, লেডি ডাক্তার ডাকুন। এবং লেডি ডাক্তার এসে খুশি হয়ে বললেন, চিন্তা করবার কিছু নেই, পেসেন্টের স্বাস্থ্য ও শরীর ঠিক আছে; আর চার মাস পরে আপনি আপনার প্রথম সন্তানের প্রাউড ফাদার হবেন হেমেন বাবু। খিল খিল ক'রে হেসে উঠলেন লেডি ডাক্তার।

ঐ তো, ঐ সেই মেয়ে, ঐ ইমা যার দিকে তাকালে হেমেন আজও আলমোড়ার লেডি ডাক্তারের সেই ভয়ংকর খিল-খিল হাসির শব্দ শুনতে পায় আর শিউরে ওঠে। কিন্তু সুরীতি সেদিনও হেমেনের মুখের দিকে যেমন শান্ত অথচ শানিত ত্বটি চক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল, আজও তেমনি ভাবে তাকায়। সেদিন যে কথা বলেছিল সুরীতি, আজও সে কথা বলে। —আমার মান বাঁচাবার জন্য তোমার সঙ্গে আমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই মাত্র। এবং সেজন্য যথেষ্ট টাকাও তোমাকে দেওয়া হয়েছে। তবে আর কেন? ওরকম আশ্চর্য হবার কোন দরকার নেই।

হুংকার দিয়েছিল হেমেন—কার কাছ থেকে, কোন্ হতভাগার বুকের কাছে গিয়ে খেলা ক'রে তুমি এই অবস্থা করেছ?

সুরীতি বলে—চুপ। চুপ ক'রে থাকবে বলেই তোমাকে এত টাকা দেওয়া হয়েছে। সাহস থাকে তো আমাকে মেরে ফেলতে পার; কিন্তু ওসব কথা কখ্‌খনো বলবে না।

হেমেন—যার কাছ থেকে এই মেয়েকে পেয়েছ, তাকে বিয়ে করলেই তো পারতে।

সুরীতি—সেটা কি তুমি শিখিয়ে দেবে? তার জন্য তৈরী হয়েই আছি। তারই সঙ্গে একদিন বিয়ে হবে।

হেমেন—কবে?

সুরীতি—যেদিন সুযোগ হবে।

হেমেন—তাহ'লে আমি কালই সেপারেশনের জন্য দরখাস্ত ক'রে দিই।

সুরীতি—দাও!

কিন্তু এই সাত বছরের মধ্যে সেপারেশনের জন্য দরখাস্ত করেনি হেমেন, এবং নিজেই তার এই ভীরুতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে। সুরীতির মেয়ে ইমা হেমেনের চোখের সামনে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে। এখন ইমার বয়স সাত বছর, এবং ওর মুখের দিকে তাকাতেও ইচ্ছা করে না হেমেনের। এই মেয়ের প্রাণটা যে সুরীতির ভয়ংকর নিঃশ্বাস দিয়ে তৈরী। মুখটা হুবহু একেবারে বসানো সুরীতির মুখ। কিন্তু শুধু আজই নয়; সেই এক বছর বয়সের ইমার মুখের দিকেও তাকাতে ইচ্ছা করেনি হেমেন। এমন ঘটনাও কতবার হ'য়েছে, হেমেনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ঢলে পড়েছে ইমা, কিন্তু হঠাৎ সাপের কামড় খাওয়া মানুষের মত ভয় পেয়ে আর যন্ত্রণাক্ত হয়ে ছুটে সরে গিয়েছে হেমেন। এই মেয়ে শুধু আইনত হেমেনের মেয়ে; পৃথিবী জানে, ইমাও জানে যে সে হলো হেমেনের মেয়ে। কিন্তু সুরীতি জানে, একদিন সুযোগ হলেই এই মেয়েকে তার সত্যিকারের বাপের কোলের কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলবে সুরীতি। প্রতীক্ষায় আছে সুরীতি, সময় হলেই তার প্রেমের জীবনের সেই মানুষের কাছে চলে যেতে হবে।

কিন্তু কোথায় সেই মানুষ? কে সে? শতবার শত হুংকার দিয়েও সুরীতির সেই প্রিয়জনের পরিচয় জানতে পারেনি হেমেন। লণ্ডন থেকে প্রতি সপ্তাহে সুরীতির কাছে যে চিঠি আসে সেই চিঠির ভিতরেও কোন নাম থাকে না। সুরীতি কিছু না বলুক, হেমেনের বুঝতে আর কিছু বাকি নেই যে, সুরীতির জীবনের আগ্রহ শুধু লণ্ডন থেকে একজনের ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে আছে। নিজেরই মান বাঁচাবার এক দুর্জয় মোহ, নইলে এতদিনে সেপারেশনের জন্য

বরখাস্ত করে দিতে পারতো হেমেন, এবং লোকের কানের কাছে চেঁচিয়ে বলে দিতে পারতো, আমি ইমার বাবা নই। ইমার বাবা আছেন লণ্ডনে।

কিন্তু কিসের জন্ম মান বাঁচাবার এই মোহ? মান কি সত্যিই আর কিছু বেঁচে আছে? কে না জেনে ফেলেছে, হেমেনের স্ত্রী সুরীতি হেমেনকে শ্রদ্ধা করে না? হেমেন শুধু নামেই স্বামী, তাই তো সুরীতির আর কোন ছেলেপিলে হয় না।

হর্ন বাজায় ট্যাক্সি। শুনে চমকে ওঠে হেমেন। হ্যাঁ, হঠাৎ ভুলেই গিয়েছিল হেমেন, চোখের সামনে রঙীন ফ্রক-পরানো একটা সাত বছর বয়সের মূর্তিকে দেখতে পেয়েই মনটা যেন এলোমেলো হয়ে অন্য চিন্তার মধ্যে গিয়ে এতক্ষণ ছটফট করছিল। কি আশ্চর্য, ইমা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ইমার বাবা যে এখন লালবাগের এক হাস্যোজ্জ্বল নিভৃতের মধ্যে বসে ইমার মার কাছে বিলাতের গল্প বলছে। আজই বিলাত থেকে বাড়িতে ফিরেছে ইমার বাবা। আর ক'দিন পরেই যে, এই ইমা তার মার হাত ধরে তার বাবার কাছে চলে যাবে।

দেখে হেসেই ফেলে হেমেন—আমার এখানে থাকতে আর একটুও ভাল লাগছে না ইমা, তাই চলে যাচ্ছি।

ইমা বলে—ভাল লাগবে; তুমি যেও না।

হেমেন হাসে—কেন ভাল লাগবে?

ইমা—আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব।

হেমেনের চোখ শিউরে ওঠে—কি বললে ইমা?

ইমা—আমি তোমাকে একটুও রাগাবো না, ঝগড়া করবো না, আমি কথ্খনো লালবাগে বেড়াতে যাব না।

যেন একটা তীব্র উত্তাপ ছুটে এসে হঠাৎ নিংড়ে দিয়েছে হেমেনের সন্ত্রস্ত দুটি চক্ষু। মাথা নেড়ে, কাঁধের আলোয়ানে চোখ ঘষে ঘষে, তারপর চোখ বন্ধ ক'রে যেন ঘুমন্ত পাগলের মত বিড় বিড় করে হেমেন—তা কেমন ক'রে হবে? অসম্ভব। তুমি তো তোমার মায়েরই মেয়ে।

ইমা বলে—না বাবা। আমি তোমার মেয়ে।

আস্তে আস্তে চেয়ারের উপর বসে পড়ে হেমেন। তার পরেই উঠে এসে ইমার ছোট্ট হাত শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে হেমেন।—ট্যাক্সিকে ফিরে যেতে বলি ইমা? কেমন?

ইমা—হ্যাঁ বাবা।

চলে যায় ট্যাক্সি। বারান্দার উপর ইমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে হেমেন, বোধহয় রাতের অন্ধকার দেখবার জন্ত। কিংবা বোধহয় প্রার্থনা করছিল

হেমেন, কালই ডাইভোর্স দাবী ক'রে দরখাস্ত করুক সুরীতি। মঞ্জুর হয়ে যাক সুরীতির দরখাস্ত। বিলেত ফেরত প্রেমিককে বিয়ে করুক সুরীতি, কিন্তু হে ভগবান, সুরীতি যেন ইমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার অধিকার না পায়। যেন এইটুকু করুণা করে আদালত।

সামনের বাড়ির কেশববাবু জানালা খুলেই হঠাৎ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—কি ব্যাপার হেমেন বাবু? মিসেসকে একা নেমন্তন্নে পাঠিয়ে বাড়ি পাহারা দিচ্ছেন বুঝি?

হেমেন—হ্যাঁ।

কেশববাবু—শুনেছেন তো খবর?

হেমেন—কি?

কেশববাবু—লালবাগের সুধাকান্ত বিলেত থেকে মেম বিয়ে ক'রে নিয়ে এসেছে।

—তাই নাকি? বলতে গিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে হেমেন। হেমেনের কানের কাছে সারা পৃথিবীটা যেন হো হো ক'রে হেসে উঠেছে। ইমা'র হাতটা আরও শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরে থাকে হেমেন। এরই মধ্যে, সামনের এই অন্ধকারের মধ্যে লুকানো এক আদালত যেন হেমেনের জীবনের আবেদন মঞ্জুর ক'রে দিয়েছে।

রাত এগারটা। কিন্তু সুরীতি এখনও ফিরে আসে না কেন?

একটা সাইকেল ছুটে এসে থামে।

হিমুর বিখ্যাত বড়লোক সেই সন্তোষ বাবুর চাকর, অর্থাৎ সুরীতির বাপের বাড়ির চাকর সনাতন সাইকেল থেকে নেমেই খবর দেয়—দিদিমনি আজ আর ফিরবেন না। শরীর খুব অসুস্থ।

পৃথিবীটা আর একবার হো হো ক'রে হেসে ওঠে হেমেনের কানের কাছে। লালবাগ থেকে তাহ'লে সোজা বাপের বাড়িতে গিয়ে চাকাভাঙ্গা রথের মত আছড়ে পড়েছে সুরীতির এত বড় প্রতিজ্ঞার হতাশ অদৃষ্ট! আজ আসবে না সুরীতি; কাল না এলে এবং অনন্তকাল না এলেও ক্ষতি কি? চিরস্থায়ী হোক এই সেপারেশন।

আর দেরি করে না হেমেন।

ইমাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যায়। বিছানার উপর নিজের বুকের কাছে ইমাকে শুইয়ে দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে থাকে হেমেন।

উঃ, রাত বারটা।

বাপেতে মেয়েতে চুপটি ক'রে ঘুমোতে থাকে।

ছাত্রীদের এই হোস্টেলে দুজন টিচারও থাকেন। মানসীদি আর মুগ্ধাদি। মানসীদি দেখতে যেমন সুন্দর, মুগ্ধাদি তেমনি আবার দেখতে একেবারে··· অর্থাৎ মুগ্ধাদির সে-মুখের দিকে তাকালে কেউ মুগ্ধ হবে না!

মানসীদির এখনও বিয়ে হয় নি; মুগ্ধাদিরও হয় নি। তবে একটা সত্য হোস্টেলের মেয়েরা এরই মধ্যে বুঝে ফেলেছে। পৃথিবীর কোনো একটি মনের ভিতর একটি জায়গা তৈরি হ'য়েই গিয়েছে, যেখান থেকে মালা চন্দন আর শঙ্খের ডাক মানসীদিকে বারবার ডাকছে। আর, মুগ্ধাদি তাঁর নিজের মনের ভিতরে আলপনা এঁকে একটা জায়গা তৈরি ক'রে রেখেছেন, আর পৃথিবীর কোন একজনকে বারবার ডাকছেন।

মানসীদিকে কেউ একজন ডাকছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ একই জায়গা থেকে মানসীদির কাছে একই রকমের নীল রঙের খামের চিঠি আসে, চিঠির গায়ে হাতের লেখাটা একই জনের। কিন্তু কি আশ্চর্য, মানসীদিকে আজ পর্যন্ত সেই এতোগুলি চিঠির একটিরও উত্তর দিতে দেখা গেল না। দিলে নিশ্চয়ই এতোদিনে অন্তত পূরবী আর অনুপা বুঝেই ফেলতো; বড় প্রখর ওদের দুজনের চোখ।

আর, কোনই সন্দেহ নেই যে, মুগ্ধাদি কোনো একজনকে চিঠি লিখে বারবার ডাকছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, মুগ্ধাদির লেখা সেই এতোগুলি চিঠির একটিরও উত্তর আজ পর্যন্ত এলো না। মালতী আর অণিমার কান বড় প্রখর; ওরা মুগ্ধাদির ঘরের দরজার কাছ দিয়ে যেতে যেতেই এক এক সময় শুনে ফেলে, মুগ্ধাদি বোধ হয় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ঠিকই, মুগ্ধাদির ঘরের ভিতরে ঢুকে অণিমা আর মালতী দেখতে পায়, স্যাঁতসেতে চোখ নিয়ে বসে আছেন মুগ্ধাদি, আর, একটা চিঠি লিখে প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন।

মানসীদির চিঠি আসে, কোনো উত্তর দেন না মানসীদি, এবং উত্তর দেন না ব'লে মনে বোধ হয় বিন্দুমাত্রও দুঃখ নেই। সব সময়েই হাসি হাসি মুখ। এমন কি, এরকম ব্যাপারও দেখা গিয়াছে যে, চিঠি আসা মাত্র পড়ে ফেললেন, আর পড়া শেষ হওয়া মাত্র চিঠিটাকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ান। তারপরেই ডাকতে

থাকেন—তোমরা এস অলকা, হিমানী, অনুপা আর···আর যার যার ইচ্ছে, সবাই এসো। আজ মেঘের ছবি আঁকতে হবে।

হোস্টেলেই ছবি আঁকার একটা ক্লাস করেন মানসীদি। এটা একটা শখের ক্লাস। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নীহারদিও বলেছেন—এই ভালো, ছুটির দিনে বাইরে গিয়ে পিকনিকের ওসব হুল্লোড় ভালো নয়।

মানসীদিকে বেশ ভালো লাগে মেয়েদের। মানসীদি আসার পর থেকে এই একটা বড়ো লাভ হয়েছে যে, ঘরের জানালা খুলে বাইরের আকাশের দিকে একবার উঁকি দেবার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নইলে নীহারদির শাসন এতোদিনে জানালাগুলিতে একেবারে মাকড়সার ঝুল ঝুলিয়ে ছাড়তো। মানসীদি নিজে ছবি আঁকতে জানেন, ছবি আঁকা শেখাতেও জানেন, মেয়েরাও ছবি আঁকা শিখতে খুব উৎসাহিত। মানসীদিরই চেষ্টায় নীহারদির শাসনের শক্ত নিয়ম একটু নরম হয়েছে। ছবি আঁকার জন্য আকাশের দিকে আর গাছপালার দিকে একটু তাকাতে হয়, নইলে ছবি আঁকা শিখবে কেমন ক'রে? মানসীদির যুক্তিটাকে অল্প বিশ্বাস ক'রেও নীহারদি জানালা খুলতে অনুমতি দিয়েছেন। মানসীদি আসার আগে মাঝরাতের ঘুমন্ত আকাশের চাঁদও দেখবার উপায় ছিলো না। মেয়েরা জেগে থাকলেও জানালাবন্ধ ঘরের শুধু অন্ধকার দেখতো।

মুগ্ধাদিকেও মেয়েরা পছন্দ করে বৈকি। মুগ্ধাদি আসার পর থেকে হোস্টেলের ভিতরের বাতাসে গানের সুরের শিহর জেগেছে। নীহারদির শাসনের শক্ত নিয়মে সিনেমা বা থিয়েটার দেখবার কোনো সুযোগ নেই। ভক্তের কীর্তন গান হোক বা অমুক গুণীর গানই হোক, হোস্টেলের বাইরে গিয়ে ওসব শোনাশুনির হুল্লোড়ের মধ্যে মেয়েদের যেতে দেওয়া হয় না।

কিন্তু মুগ্ধাদিই অনেক বুঝিয়ে নীহারদিকে রাজি করিয়ে মেয়েদের অন্তত এই উপকারটুকু করেছেন যে, এখন হোস্টেলের মধ্যেই সপ্তাহের একটি দিনে মেয়েরা নিজেরাই গলা ছাড়বার সুযোগ পায়। গানের একটা ক্লাস করেন মুগ্ধাদি। হোস্টলের ভিতরেই যখন, তখন সপ্তাহে একটি দিন একটু সুরের হুল্লোড় না হয় হোক। অনুমতি দিয়েছেন নীহারদি।

নীহারদির শাসনের শক্ত নিয়মগুলি নরম হয়েছে, ছবির রং আর গানের সুর লেগেছে হোস্টেলের জীবনে। মানসী আর মুগ্ধাদিকে খুব ভালও লেগেছে, তাই অণিমা মালতী অলকা পারুল পূরবী অনুপা আর সুলেখারাও ভালোই থাকে। ভালোলাগে না শুধু মনের ঐ ছুটি খটকা। চিঠি আসে

মানসীদির। কিন্তু সেই চিঠিকে এতো অবহেলা কেন? চুলের তেলচিটে ফিতেটাকে এক এক সময় যেমন হঠাৎ হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে একটা দলা ক'রে নিয়ে তাকের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেন মানসীদি, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে ঐ চিঠিকেও মাঝে মাঝে ঐভাবে এখানে ওখানে ছুঁড়ে ফেলে দেন। কেউ একজন ডাকছে, কিন্তু সেই ডাক শুনতে বোধ হয় ভালো লাগে না মানসীদির। চিঠিগুলির শেষ পর্যন্ত কি দশা হয় কে জানে? হয়তো রাত্রিবেলা দরজা বন্ধ ক'রে আর একবার পড়েন, তার পরেই কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দেন। চিঠিগুলিকে অবহেলা ক'রতে একটুও দুঃখ বোধ করেন না মানসীদি। মনে হয়, অবহেলা ক'রেই সুখ পাচ্ছেন। তা না হলে, সব সময় এতো হাসবেন কেন?

মানসীদির দুর্বোধ্য হাসিটাকে একটা সমস্যার মতো মনে হয়, কিন্তু ওটা হাসি ব'লেই মেয়েদের চোখে সহজে সহ্যও হয়ে যায়। মালতী আর অণিমা, কিংবা কেতকী আর অনুপা সেই হাসি দেখে মুখ কালো ক'রে তাকায় না। ওদের মনের খটকা মনের ভিতরেই শুধু কতোগুলি আবছা ধারণাকে নিয়ে খেলা করে; স্পষ্ট ক'রে কিছু বুঝে উঠতে দেয় না।

কিন্তু মুগ্ধাদির ঐ স্যাঁতসেতে চোখ দেখলে আর ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলে মুখ কালো ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবতেই হয়। অলকা ভাবে, হিমানী ভাবে, পূরবী কিছু ভাবতেই না পেরে শুধু হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে।

খুবই দুঃখের কথা, মুগ্ধাদিকে আজ পর্যন্ত হাসতেই দেখা গেলো না। মুগ্ধাদির ছোট কপালের দু'পাশটা কেমন উঁচু উঁচু, নাকটার সামনের দিকটা বেশ একটু চাপা; তা ছাড়া মুগ্ধাদির গায়ের রংটাও বেশ একটু কালো। কথা বললে বোঝা যায়, দাঁতগুলি বেশ বড়ো বড়ো। মুগ্ধাদিকে মেয়েরা ভালোবাসে, তাই ওরা মুগ্ধাদির চেহারা নিয়ে আলোচনা করবার সময় শুধু বলে, মুগ্ধাদি দেখতে একটুও ভালো নয়। ভালোবাসে ব'লেই হয় তো মুগ্ধাদিকে কুৎসিত বলতে পারে না।

মনে হয়, মুগ্ধাদি তাঁর ঐ দেখতে একটুও ভালো নয় চেহারাটাকেই নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। ঐ তো চেহারা, তবু মনের এক জায়গায় আলপনা এঁকে ফেলেছেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত অনুভব করতে পারছেন, ঐ আলপনা-আঁকা স্থানটিতে তাঁর চিঠির মানুষ কোনদিনও আসবেন না। বার বার ডাকছেন, কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে সেই ডাক।

কিন্তু কি আশ্চর্য, চিঠি লেখা শেষ করার পর সেই স্যাঁতসেতে চোখ

নিয়ে চুপ ক'রে বসে থাকেন না মুগ্ধাদি। হঠাৎ উঠে দাঁড়ান, ঘরের বাইরে এসে ডাক দেন—অণিমা, পারুল, পূরবী তোমরা কোথায় আছো? গানের ক্লাসে এসো।

গানের ক্লাসে এসে যখন গাইতে থাকেন মুগ্ধাদি তখন মনে হয় যেন তাঁর স্যাঁতসেতে চোখ দুটোকে তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন। কী মিষ্টি সেই সান্ত্বনার সুর! এমনিতে অন্যসময় মুখটাকে কেমন জড়ো-সড়ো ক'রে রাখেন মুগ্ধাদি। কিন্তু গান গাইবার সময় চেহারার কথা বোধ হয় ভুলে যান। দাঁতগুলি আরও বড় দেখায়, মুখটা কাঁপে আর বেঁকে যায়। দেখতে আরও বেশ একটু মোটেই ভালো নয় হয়ে যান মুগ্ধাদি।

মানসীদির হাসির আর মুগ্ধাদির স্যাঁতসেতে চোখের রহস্য স্পষ্ট ক'রে বোঝা যায় না। এই দুই রহস্যের মধ্যে দু'টি ভিন্ন ধরনের সমস্যার ছায়া লুকিয়ে রয়েছে, এই মাত্র বুঝতে পারে মেয়েরা, কিন্তু বুঝলেও এই সব ব্যাপারে ওদের আর বলবার কি আছে? ওরা শুধু চায় যে, মানসীদি যেন চিঠির উত্তর দেন, আর মুগ্ধাদির যেন চিঠির উত্তর আসে।

মানসীদি যেন তাঁর মুখের সব সময়ের হাসি একটু কম ক'রে নিয়ে আনমনা হয়ে একটু ভাবেন, আর ভাবতে গিয়ে মানসীদির চোখে যেন সামান্য একটু বাষ্পের ছায়া দেখা দেয়। তা হ'লে মানসীদির সুন্দর মুখটা আরও ভালো দেখাবে। সব সময় হাসি হাসি মুখ দেখতেও তো একঘেয়ে লাগে।

মুগ্ধাদির কথা ভাবতে গিয়ে, এবং এক এক সময়ে আড়ালে দল পাকিয়ে বসে আলোচনা ক'রতে গিয়েও মালতী, অণিমা, হিমানী আর পারুলেরাও ভাবে, মুগ্ধাদি কি সত্যিই কোনো দিন একটুও হাসবেন না? সব সময় অতো গম্ভীর হয়ে, বিষণ্ণ হয়ে আর স্যাঁতসেতে চোখ নিয়ে পড়ে থাকেন কেন মুগ্ধাদি? একে তো দেখতে মোটেই ভালো নন, তার উপর এতো গম্ভীর। মনে হয় মুগ্ধাদি যদি একটু হাসতেন তবে নিশ্চয়ই মুগ্ধাদিকে একটু ভালোই দেখাতো। সব সময় মুগ্ধাদির শুকনো মুখটা দেখতেও যে একঘেয়ে লাগে।

অন্তত দু'টো জিনিস যদি দু'জনে ভাগাভাগি করে নিতেন, তবে বড় ভালো হ'তো। মানসীদির অত বেশি হাসির কিছুটা যদি মুগ্ধাদি পেতেন, আর মুগ্ধাদির অত বেশি বিষণ্ণতার কিছুটা মানসীদি নিতেন, তা হ'লে অন্তত এই হোস্টেলের এতগুলি মেয়ের চোখের ইচ্ছা মিটে যেতো।

মানসীদি আর মুগ্ধাদি দু'জনে যখন আলাপ করেন তখন সেই আলাপও

শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু পারুল পূরবী আর অণিমারা শুনে খুব বেশি খুশি হয় না।

মানসীদি হেসে হেসে বলেন—আমি যদি তোমার মতো এরকম মিষ্টি গলা পেতাম মুগ্ধা।

মুগ্ধাদি সেই রকম শুকনো মুখ নিয়েই বলেন—আমি যদি তোমার মতো অমন সুন্দর ছবি আঁকার হাত পেতাম মানসী।

কিন্তু সত্যিই দু'জনে যদি দুজনের ঐ বিশেষ দু'টি সুন্দর গুণ পেয়েই যেতেন তবে কি দু'জনেই সমান হয়ে উঠতেন? পারুল, হিমানী আর অনুপা ভাবে—ওভাবে নয়, ওতে কিছু হবে না। মানসীদির মুখটা বড়ো বেশি সুন্দর। মানসীদির নাক মুখ চোখ আর রঙের ঐশ্বর্য থেকে কিছুটা তুলে নিয়ে যদি মুগ্ধাদির মুখে···।

অলকা আর মালতী প্রতিবাদ ক'রে বলে—তা নয়, মুগ্ধাদির ঐ কালো মুখের কিছুটা রঙ্ আর গড়ন যদি তুলে নিয়ে মানসীদির মুখে···।

তা হ'লে মন্দ হতো কি?

তা হ'লে একজনের মুখটা এতো বেশি ভালো এবং আর একজনের মুখটা এতো বেশি কম-ভালো দেখাতো না। তা হ'লে মোটামুটি বেশ ভালোই দেখাতো দু'জনকে। সত্যিই রূপের দিক দিয়ে একজন বড়ো বেশি পেয়ে গিয়েছেন এবং আর একজন বড়ো কম ক'রে পেয়েছেন। অবিচার ব'লেই মনে হয়। এক্ষেত্রে ভগবানের যদি একটু সুবিচার থাকতো, তবে সমস্যাটা মিটেই যেতো বোধ হয়।

পারুল বলে—বল্ হিমানী, তা হ'লে সমস্যা মিটে যেতো কি না?

হিমানী—নিশ্চয়ই।

অর্থাৎ, তা হ'লে নিশ্চয়ই মানসীদি ঐ সব চিঠির উত্তর দিতেন, আর মুগ্ধাদিরও চিঠির উত্তর আসতো।

মানসীদির আর মুগ্ধাদির জীবনের সমস্যাটা যে দুটো ভিন্ন রূপে দেখা দিয়েছে, একটা পার্থক্য আছে, সেটা তো বুঝতেই পারা যায়। একজনের মুখে অবহেলার হাসি, এবং আর একজনের চোখে আবেদনের অশ্রুসিক্ততা। কিন্তু কল্পনা করা যায়, দুই সমস্যা একই রকমের। মানসীদির মনকে ডেকে ডেকেও কাছে পাচ্ছেন না একজন। চিঠির ওপারে নিশ্চয়ই একটা বিষণ্ণ মুখ আর এক জোড়া স্যাঁতসেতে চোখ রয়েছে। সেই মানুষ বোধ হয় মুগ্ধাদির মতোই তাঁর চিঠির সাড়া না পেয়ে ছোটো ছোটো দীর্ঘশ্বাস সহ করছেন।

আর, মুগ্ধাদি তাঁর ভেজা চোখ, শুকনো মুখ আর ছোটো ছোটো দীর্ঘশ্বাস নিয়ে যাঁকে ডাকছেন, তিনি নিশ্চয়ই অবহেলার হাসি হাসছেন, ঠিক মানসীদির মতো। মুগ্ধাদির ডাক তিনি শুনতে চাইছেন না। মুগ্ধাদির চিঠি পাওয়া মাত্র বোধ হয় কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়েও ফেলে দিচ্ছেন।

মানসীদির বোধ হয় মনে পড়ে যায় সেই মানুষটার মুখটা, নিশ্চয়ই ভালো লাগে না সেই মুখকে। মানসীদির মতো সুন্দর মুখকে জীবনের মালাচন্দন দিয়ে সাজাবার জন্য কাছে পেতে হ'লে বেশ সুন্দর একটি মুখ থাকা চাই। সেইরকম মানুষ হওয়া চাই। কিন্তু মানসীদিকে যিনি চিঠি লেখেন, তিনি সেইরকম রূপের মানুষ নিশ্চয়ই নন। হ'লে, মানসীদি সেই মানুষের চিঠির আবেদনকে এতো তুচ্ছ ক'রতে পারতেন কি?

মুগ্ধাদির প্রাণ যাঁকে কাছে পাওয়ার জন্য ছটফট ক'রে ডাকছে, তাঁর কাছে মুগ্ধাদি বোধ হয় একটি বিশ্রীতার নারী মাত্র। মুগ্ধাদির মুখটা যদি একটু সুন্দর হ'তো, তা হ'লে কি সেই মানুষ মুগ্ধাদির এতোগুলি চিঠির একটিতেও না মুগ্ধ হ'য়ে থাকতে পারতেন?

এই পর্যন্ত বুঝে নিয়ে তারপর পুরবী হিমানী ও অনুপা আর কিছু বুঝতে পারে না।

এইভাবেই চলছে। প্রতি সপ্তাহে একবার ছবির ক্লাসে এবং একবার গানের ক্লাসে মানসীদি আর মুগ্ধাদি সেই একঘেয়ে মুখের ভাব নিয়ে আসেন আর চলে যান। একজনের মুখের একঘেয়ে হাসি, এবং আর একজনের চোখের একঘেয়ে স্যাঁতসেঁতে বিষাদ।

কিন্তু এর পর, ঠিক প্রথম কবে এই নিয়মের একটু ব্যতিক্রম হ'য়ে গেলো, সেটা জানতেই পারেনি পারুল, অণিমা আর হিমানীরা। যেদিন দেখলো, সেদিন দেখে কিছু বুঝতে না পেরেই ওদের মনের খটকা আর একটু জটিল হ'য়ে গেলো।

মানসীদির মুখের সেই সদাচঞ্চল অবহেলার হাসি একটু কমে গিয়েছে। ছবি আঁকতে আঁকতেই আনমনা হয়ে কি যেন ভাবেন মানসীদি। চোখ দুটোও যেন কেমন হ'য়ে ওঠে, যেন হঠাৎ একটা দূরের মেঘের ছায়া পড়েছে সেই চোখে।

আর, মুগ্ধাদির শুকনো মুখ আরও শুকনো হ'য়ে গিয়েছে। চোখ দুটো যেন সবসময় ধোঁয়ায় জ্বালা লেগে জলছে। মুগ্ধাদিকে এখন দেখলে এই কথাই মনে হয়, জীবনে কোনোদিন ঐ মুখে যে হাসি ফুটে উঠবে, এমন

আশা নেই। সব আশার শেষ ক'রে দিয়েছেন মুগ্ধাদি, যেন অবহেলা পাওয়ার জন্যও আশা করার অধিকার ফুরিয়ে গিয়েছে চিরকালের মতো।

কবে থেকে দু'জনের মুখের চেহারার সেই একঘেয়ে নিয়ম বদলে গিয়েছে, সেটা ঠিক ঘটনার দিন থেকেই দেখতে জানতেও বুঝতে পারেনি পারুল, হিমানী আর অলকারা।

—এখনো বসে বসে কি ক'রছো মুগ্ধা? বলতে বলতে আর হাসতে হাসতে মুগ্ধার ঘরে ঢুকলো মানসী। সবেমাত্র মানসীর যে চিঠিটা এসেছে, সেই চিঠিটা অবহেলার সঙ্গে হাতে ধ'রে রেখেছে মানসী।

প্রাণ ঢেলে দিয়ে এতোক্ষণ ধ'রে যে চিঠিটা লিখছিলো মুগ্ধা, সেই চিঠিটাকে হঠাৎ হাত দিয়ে ঢেকে মুগ্ধা বলে—একটা চিঠি লিখছি মানসী।

মানসী মুখ টিপে হাসে—তুমি চিঠি লেখো না কি মুগ্ধা?

মুগ্ধা বলে—হ্যাঁ ভাই, লিখি।

মানসী যেন ধমক দিয়ে হাসতে থাকে—লিখবে না কখ্খনো।

মুগ্ধা—না লিখে পারিনা ভাই।

মানসী চোখ বড়ো ক'রে বলে—এতদূর গড়িয়েছে! তাই বলো!

হঠাৎ চমকে ওঠে মুগ্ধার দুই চোখ। মানসীর হাতের চিঠিটারই দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে। যেন একটা শূন্যতার দিকে তাকিয়ে আছে মুগ্ধা, এবং দেখতে পাচ্ছে, তার কতো পরিচিত সেই হাতের লেখা ফুটে রয়েছে এই শূন্যতারই মধ্যে একটি খামের গায়ে। ঐ হাতের লেখারই একটি চিঠি মুগ্ধার কাছে শেষ বারের মতো এসে কবেই আসা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আর আসে না। তবুও সেই হাতের লেখা চিঠির আসার আশা না ছেড়ে দিয়ে আজও তারই কাছে চিঠি লিখেছে মুগ্ধা।

হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, সেই হাতেরই লেখা চিঠি এসেছে। স্তব্ধ দু'টি চক্ষু নিয়ে দেখছে মুগ্ধা। তবে পার্থক্য এই যে, চিঠিটা তার নয়। চিঠিটা হ'লো মানসীর। খামের গায়ে কতো স্পষ্ট ক'রে আর কত যত্ন ক'রে সেই হাতেরই লেখায় মানসীর নামটা লেখা রয়েছে।

মানসী বলে—আমাকে খুব সন্দেহ ক'রে নিচ্ছো মুগ্ধা, না?

মুগ্ধা উদাসভাবে তাকিয়ে বলে—না ভাই, তোমাকে সন্দেহ ক'রবো কেন?

মানসী হাসে—তোমার বোধ হয় সন্দেহ হচ্ছে যে, আমিও চিঠি লিখি।

মুগ্ধাদির শুকনো চোখ একটু বিস্মিত হয়।—চিঠি লেখো না তুমি?

মানসী অবহেলার হাসি হেসে বলে—কখ্খনো না।

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবে মানসী। তারপর বলে—এ এক মহা উৎপাত হ'য়ে উঠেছে। আমার মনে কোনোই ইচ্ছা নেই, তবু তিনি মন-প্রাণ ঢেলে লিখেই চলেছেন।

দেখতে পায় মুগ্ধা, চিঠিটাকে চিমটি দিয়ে আবহেলার ভঙ্গিতে ধ'রে রয়েছে মানসী, যেন সত্যিই একটা অস্পৃশ্য বস্তু।

মুগ্ধার হাত যে চিঠিকে রত্ন ব'লে মনে ক'রে হাতে তুলে নিতে চায়, সেই চিঠিকেই যেন কোথায় কোন ডাষ্টবিনের মধ্যে ফেলে দিতে চলেছে মানসী। জানে না মানসী, কল্পনাও ক'রতে পারবে না রূপের সৌভাগ্যে সুন্দর এই মেয়ে, মন-প্রাণ ঢেলে লেখা চিঠির অপমান হ'লে মন কেমন পুড়ে যায়।

হেমন্তের হাতের লেখা চিনতে পৃথিবীর আর যারই ভুল হোক মুগ্ধার চোখে ভুল হ'তে পারে না। ঐ হাতের লেখাতেই যে জীবনে প্রথম ভালবাসার আশ্বাস এসেছিলো মুগ্ধার জীবনে। মুগ্ধার কালো কুৎসিত মুখটাকে দুর্লভ সম্মানে হাসিয়ে দিয়েছিলো জীবনের সেই প্রথম পরিচিত মানুষটির, সেই হেমন্তের মুখের একটি কথা আর হাতের লেখা কয়েকটি কথা।

কিন্তু তারপর কেমন ক'রে আর কেন যে জীবনের সেই আশ্বাস লুকিয়ে পড়লো হঠাৎ, বুঝতেও পারেনি মুগ্ধা। কিন্তু আজ এতদিন পরে সেই না-বোঝা রহস্যকে চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছে মুগ্ধা! মুগ্ধার কুৎসিত মুখটাকে হয়তো এক দুঃস্বপ্নের মধ্যে দেখে হঠাৎ আতঙ্কিত হয়ে……কিংবা এক সুস্বপ্নের মধ্যে মানসীর সুন্দর মুখটা হঠাৎ দেখতে পেয়ে সেই মানুষের জীবনের আহ্বান পথ বদল ক'রে ফেলেছে। কবে? কবে হেমন্তের সঙ্গে মানসীর দেখা হ'লো?

আর এই প্রশ্ন নিয়ে মনটাকে মাতিয়ে কাঁদিয়ে কোন লাভ নেই। হেমন্ত তার জীবনের স্বপ্ন খুঁজতে গিয়ে মানসীকে দেখে ফেলেছে আর ডাকছে মানসীকেই। হেমন্তের এই সুন্দর স্বপ্নের জগতে একেবারে অবান্তর হয়ে গিয়েছে কুৎসিত মুখের মেয়ে মুগ্ধা। তবে আর কেন? হাতের আড়ালে লুকানো এই চিঠিটাকে এখন মানসীর চোখের সামনে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ে দিয়ে এখনি মুক্ত হ'য়ে গেলেই তো পারে মুগ্ধা।

মানসীর সুন্দর মুখের জন্য আজ স্বপ্ন দেখছে হেমন্ত। কিন্তু মানসী তুচ্ছতার হাসি দিয়ে হেমন্তের সেই স্বপ্নকে কুচি কুচি ক'রে ছিঁড়ছে। বেশ হয়েছে! হেমন্তের মন-ঢেলে লেখা চিঠির অপমান দেখে এই মুহূর্তে ইচ্ছা ক'রলেই হেসে উঠতে পারে মুগ্ধা।

কিন্তু কি আশ্চর্য, হেসে উঠতে ইচ্ছা করে না মানসীকে ভালোবেসেছে হেমন্ত। খুব সুন্দর মেয়ের কাছে প্রেম আশা ক'রছে এমন একজন, যে এমন কিছু সুন্দর নয়। মুগ্ধার কপালে যে অভিশাপের কামড় পড়েছে, সেই অভিশাপের কামড় পড়েছে হেমন্তের কপালে।

হেসে নিলেই তো পারে মুগ্ধা। কিন্তু হাসতে পারে না। মানসীর হাতের ঘৃণায় আধমরা হ'য়ে রয়েছে হেমন্তের চিঠিটা, দেখতে দেখতে মুগ্ধার চোখ দুটো যেন ধোঁয়ার জ্বালা লেগে ছলছল ক'রে ওঠে? মানসীর মনটা কি সত্যিই কতগুলি হাসির পাথর দিয়ে তৈরি, নিরেট আর নির্মম, সামান্য একটু বেদনার দাগও লাগে না।

হঠাৎ ব'লে ওঠে মুগ্ধা—চিঠির উত্তর একটা দিতে দোষ কি মানসী।

মানসী হাসে—কি ছাই উত্তর দেবো? যে চিঠির কোন দরকার নেই, সেই চিঠিকে…।

মুগ্ধা—অন্তত এইটুকু তো লিখতে পারো যে, চিঠি চাই না, আর কখনো লিখবেন না।

মানসী হেসে ওঠে—তা পারি।

সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে আরও কালো হয়ে যায় মুগ্ধার কালো মুখ। মুগ্ধা বিচলিতভাবে বলে—না, না; অতো কঠিন ক'রে না লিখলেই ভালো হয় মানসী।

মানসী বলে—কিন্তু লিখলে এছাড়া আর কি ছাই লিখবো বলো? আমার মনের মধ্যে কিছু নেই যখন, তখন কেন স্পষ্ট কথা ছাড়া…।

মানসীর কথা থামবার আগেই আবার ভয় পেয়ে চমকে ওঠে মুগ্ধা; বোধ হয় শুনতেই পায় না, শেষ পর্যন্ত কি বললো মানসী।

কী ভয়ানক হাসির পাথর হয়ে রয়েছে মানসী! হেমন্তর মনের বেদনা কল্পনাও ক'রতে পারে না। যদি দেখতে পেতো মানসী, যদি মানসীকে এই মুহূর্তে মুগ্ধা তার বুকের ভিতরটা দেখিয়ে দিয়ে বলতে পারতো, এই দেখো মানসী, যে মানুষটা ঘৃণা ক'রে আমার ভেতরটা পুড়িয়ে কালো ক'রে দিয়েছে, সেই মানুষেরই বুকের ভেতরটা তুমিও ঠিক এমনিতর পুড়িয়ে কয়লা ক'রে দিচ্ছো।

কিন্তু সেই গোপনের ইতিহাস চিরকালের মতো গোপনেই থেকে যাক। মানসী কোনো দিনই জানতে পারবে না, ঐ হেমন্তই মুগ্ধাকে একদিন ঐরকমেরই নীলরঙের খামের চিঠিতে ভালোবাসার আশ্বাস জানিয়েছিলো।

এই একটি কথা মানসীকে ব'লে দিলেই তো এই মুহূর্তে সেই আশ্বাসভঙ্গের প্রতিশোধ ভালো ক'রেই তুলে নিতে পারা যায়। রূপের গর্বের মানসী ঘেন্না ক'রেও হেমন্তের চিঠির কোনো উত্তর দেবে না কোনোকালে। পুড়ে পুড়ে আরও কয়লা হয়ে যাবে লোকটার বড়ো স্বপ্ন-ধরা মন। কিন্তু ছিঃ, সে কি ক'রে হয়!

সে তো হ'তেই পারে না, বরং মানসীকে দিয়েই একটি ছোট আশ্বাসের কথা কি লেখানো যেতে পারে না সেই মানুষটির কাছে? মানসীকে কি বোঝানো যায় না যে, শুধু মুখের রঙের দিকে তাকিয়ে ভালোবাসার বিচার করতে নেই।

মানসী কল্পনা না ক'রতে পারুক, মুগ্ধা যেন দেখতেই পাচ্ছে, মানসীকে ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে সেই মানুষটার প্রাণ দিন-রাত কেমন ক'রে পুড়ছে।

চুপ ক'রে আরও কিছুক্ষণ কি-যেন ভেবে নেয় মুগ্ধা। হাসির পাথর দিয়ে তৈরি মানসীর মনটাকে কি কোনো উত্তাপ দিয়ে নরম করা যায় না?

হঠাৎ ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ায় মুগ্ধা। অসমাপ্ত চিঠিটাকে টেবিলের এক পাশে সরিয়ে আর বই দিয়ে চেপে রেখে ঘরের বাইরে চলে যায় মুগ্ধা—তুমি একটু বসো মানসী, আমি এখনি আসছি।

ঐ ছোটো ঘরে, এই দুপুরের উত্তাপের মধ্যে যে ঘরের জানলার গায়ে বাইরের জামরুলের স্নিগ্ধ ছায়া পড়েছে, সেই ছোটো ঘরের ভিতরে ঢুকে একবার এসরাজটা হাতে তুলে নিতে ইচ্ছা করে মুগ্ধার। কিন্তু থাক, নীহারদি আবার কি মনে ক'রবেন। ভাবতে ভালোই লাগছে, পথ চাওয়া জীবনটা প্রতীক্ষার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো হঠাৎ। মানসীর হাতে হেমন্তের চিঠি দেখতে পেয়ে ভালোই হ'লো! শুকনো আর কুৎসিত মুখের মধ্যে তেমনি বিশ্রী স্যাঁতসেতে চক্ষু দুটো এতোদিনে সব কৌতূহলের ব্রত সাঙ্গ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গেলো।

কিন্তু এ আবার কি হলো? মনটা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হয় না কেন? কেন বার বার মনে পড়ে মুগ্ধার, তারই মনের জ্বালার মতো একটা জ্বালায় পুড়ছে হেমন্তের মন; সেই হেমন্ত যে-মানুষ জীবনে প্রথম ভালবাসার চক্ষু নিয়ে তাকিয়েছিলো মুগ্ধার কুৎসিত মুখের দিকে।

বোধ হয় ঠিক হেমন্তের জন্য নয়, হেমন্তের বুকের হতাশার জ্বালাটারই জন্য বড়ো বেশী মায়া ছটফট ক'রছে মুগ্ধার মনের ভিতরে। সুন্দর মুখের মানসী বড়ো নিষ্ঠুর হয়ে হেমন্তের বুক ভাঙছে। একটু কৌশল, একটু

মনের জোর যেন আজ প্রাণপণে পেতে চাইছে মুগ্ধা, যেটুকু পেলে হেমন্তকে বুক ভেঙ্গে যাবার বেদনা থেকে বাঁচাতে পারবে। একটু শক্তি খুঁজছে মুগ্ধা, যেন চোখের এক ফোঁটাও জল দেখা না দেয়। মানসীর কঠিন মনটাকে যদি ভালোবাসার ভাষা দিয়ে একটু ভাবিয়ে নিয়ে বেদনা দিতে পারা যায়, তবে হয়তো মিথ্যে হয়ে যাবে না হেমন্তের স্বপ্ন।

ভালবাসার বদলে যদি ঘৃণা পায় মানুষ, তবে মানুষের মনের বেদনা কত দুঃসহ হ'তে পারে, তারই পরিচয় একবার জেনে নিক মানসী। মুগ্ধার ঐ চিঠির মধ্যেই ছত্রে ছত্রে সেই বেদনার জ্বালা যে পুড়ছে। মানসী কি হাতের কাছে সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দেবে, একবার পড়ে নেবে না মুগ্ধার ঐ চিঠির বুকের ভাষা? এমন শান্ত কৌতূহলের মেয়ে তো নয় মানসী।

মুগ্ধার ধারণা মিথ্যা নয়, এবং মুগ্ধার কৌশলও মিথ্যা হ'য়ে গেলো না। মুগ্ধা ঘরের বাইরে চলে যাওয়া মাত্র, ঝক ক'রে হেসে ওঠে মানসীর চোখ। মুগ্ধার বই-চাপা চিঠিটা চোরের মত খপ ক'রে হাতে তুলে নিয়ে পড়তে থাকে মানসী।

জীবনের চিরবিশ্বাসের এক দেবতাকে চিঠি লিখেছে মুগ্ধা, দেবতার নামটা অবশ্য লেখা নেই। অদ্ভুত এই গম্ভীর আর শুকনো মুখের মেয়ে মুগ্ধা! হেসে হেসে আর চিঠি পড়তে পড়তে আশ্চর্য হয় মানসী; এতো ভাবাও লুকিয়ে থাকতে পারে মুগ্ধার মতো মেয়ের মনের ভিতরে! অদ্ভুত ......পড়তে পড়তে হঠাৎ চমকে ওঠে মানসীর চোখ, মুখের হাসি এলো-মেলো হয়ে যায়। কি ভয়ানক জ্বালা ছড়িয়ে রেখেছে মুগ্ধা।

—বুঝতে পারবে না তুমি, কেন তোমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়েও তোমাকে চিঠি লিখি। তুমি বুঝতে পারবে না, কেন লিখি। যদি বুঝতে, মানুষ কাউকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবেসে ফেললে কি হ'য়ে যায় তার মন আর জীবন, তবে তুমি চিঠির উত্তর দিতে। কিন্তু আমি তো না লিখে থাকতে পারি না। তোমাকে বার বার লিখি এইজন্য যে তুমি বার বার আমার চিঠিকে তুচ্ছ ক'রবে, ঘৃণা ক'রবে আর উত্তর দেবে না। তোমারই কাছ থেকে বার বার এই আঘাতের জ্বালাটুকু পাওয়ারই লোভ যে আমাকে পেয়ে বসেছে; তাই না লিখে পারিনা।

ব্যস্তভাবে মুগ্ধার সেই জ্বালা-ভরা চিঠিটাকে আবার বই চাপা দিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে মানসী। মুগ্ধা যখন ভিতরে এসে আবার

ঘরে ঢুকে মানসীর মুখের দিকে তাকায়, তখন মানসী দেখতে পায় না যে, মুগ্ধা ওরই দিকে ব্যাকুল ভাবে তাকিয়ে কি যেন বুঝবার চেষ্টা ক'রছে! আনমনা হয়ে, সুন্দর মুখের হাসিটাকে একটু লুকিয়ে রেখে কি-যেন ভাবছে মানসী। মুগ্ধা দেখতে পায়, চিমটি দিয়ে অবহেলার সঙ্গে যে চিঠিকে ধরে রেখছিলো মানসী, সেই চিঠিকেই যেন কেমন একটু শক্ত ক'রে খিমচে ধ'রে রেখেছে মানসী, যেন হঠাৎ হাত থেকে ফসকে মেঝের ধুলোর উপর না পড়ে যায়।

খুশি হয় মুগ্ধার দুই চক্ষু। চলে যায় মানসী।

মুগ্ধার জীবনে তবু চিঠি লেখার ব্রত এখনো ফুরলো না। এই আর এক বিস্ময়। চিঠি লেখে মুগ্ধা, সেই এক চিরবিশ্বাসের দেবতারই কাছে, কিন্তু শুধু লেখার জন্যই লেখা, সেই চিঠি খামে বন্ধ হ'য়ে সত্যিই হেমন্ত নামে কোনো মানুষের ঠিকানায় চলে যায় না। এ যেন, সেই একই ব্রত, কিন্তু মানতটা ভিন্ন।

নিজের জন্য নয়; মানসীর জন্যই চিঠি লেখার ব্রত এখনও সাঙ্গ ক'রতে পারছে না মুগ্ধা। কারণ, মানসী কোনো না কোনো অজুহাতে মাঝে মাঝে হঠাৎ মুগ্ধার ঘরে এসে ঢোকে, যেন কতোগুলি মন্ত্রের সন্ধানে। হাসির পাথর দিয়ে তৈরি মনটা নরম হয়েছে, ভয় পাচ্ছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না মানসী। ভালবাসার অপমান হ'লে মানুষ কি সত্যিই ঐ রকম ভয়ানক দুঃখ পায়? ঐ রকমই দুঃখ পাচ্ছে কি হেমন্ত?

হিমানী পারুল আর পূরবীরা একদিন দেখে অবাক হয়ে যায়; সত্যিই চিঠির উত্তর লিখছেন মানসীদি। যেন দু'লাইন লিখে সব কথা শেষ ক'রে দিলেন মানসীদি। তারপর একদিন, তারপর আবার। কোথা থেকে যেন সন্ধান ক'রে মনের ভিতর নতুন ভাবা আর আগ্রহ, আর সেই সঙ্গে একটু বেদনাও যেন নিয়ে আসছেন মানসীদি। মানসীদির চিঠির লেখাগুলিও যেন দিনে দিনে বড়ো হয়ে যাচ্ছে। দু'লাইনের লেখা আর নয়, পাতা ভ'রে চিঠি লিখতে শুরু ক'রেছেন মানসীদি!

জানে না অনুপা মালতী আর অলকারা, কেন আর কেমন ক'রে একমাসের মধ্যেই ঘটনাটা এরকম আর একটু দুর্বোধ্য হয়ে গেলো।

চিঠি লিখছে মুগ্ধা, সে চিঠি ডাকে যায় না। মানসীর দুই চক্ষু ভালবাসার ভাষা খুঁজছে, ভালবাসা বুঝতে চাইছে, তাই মুগ্ধার ঘরে ঢুকে

টেবিলের উপর সন্ধান করে, কোথাও আছে কি না মুগ্ধার লেখা কোনো চিঠি। কী সুন্দর মন মাতানো ভাষায় ভালবাসার কথা লিখতে পারে মুগ্ধা।

মুগ্ধাও জীবনে যেন এক অদ্ভুত ব্রতের খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। তার কুৎসিত প্রাণের বেদনাগুলির ছোঁয়া দিয়ে সুন্দর প্রাণের মেয়ে মানসীর মনে পাথরের ফুলকে মোহ-মাখানো ঘুম থেকে জাগাতে হবে। হেমন্তের চিঠির উত্তর দিতে থাকবে মানসী, চিঠি এলেই হেসে উঠবে মানসীর চোখ, আর চিঠি না আসা পর্যন্ত হেমন্তের কথা ভাবতে ভাবতে মানসীর চোখে যেদিন বেদনার মেঘ দেখতে পাবে, সেদিন বুঝবে মুগ্ধা, তার মানত পূর্ণ হ'তে চলেছে।

ইচ্ছা ক'রেই মিথ্যা এক প্রেমের মানুষের উদ্দেশে একটি ক'রে মিথ্যা চিঠি লিখেই চলেছে মুগ্ধা! ভালবাসার ভাষাগুলিও অদ্ভুত। যেন পাথর চাপা ঝরণার কলরোল। মুগ্ধার ঘরের টেবিলে বই-চাপা হ'য়ে পড়ে থাকে এই চিঠি। মানসী ঘরে ঢুকলেই মুগ্ধা বলে—তুমি একটু ব'সো মানসী, আমি এখুনি আসছি। ঘরের বাইরে চলে যায় মুগ্ধা।

পৃথিবীতে কেউ জানবে না কোনদিন, শুধু মুগ্ধাই তার এই জানা নিয়ে পৃথিবী থেকে একদিন বিদায় নেবে যে, হেমন্তের ভালবাসাকে অপমান হ'তে রক্ষার জন্য অদ্ভুত মানত করেছিলো কুৎসিত এক মেয়ে; তার নাম মুগ্ধা। হাসির পাথর দিয়ে তৈরি এক সুন্দর মেয়ের মনকে নরম ক'রে দিতে পেরেছে মুগ্ধা। মানসীর মনের জন্য ভালবাসার ভাষা জুগিয়ে গিয়েছে মুগ্ধা। একটু ক্লান্ত হয় নি, একটুও খারাপ লাগেনি মুগ্ধার।

মুগ্ধার মানত সফল হয়েছে। সেই সংবাদই একদিন শোনা গেলো হোস্টেলের সব মেয়ের মুখে মুখে ধ্বনিত একটি মিষ্টি সংবাদের মধ্যে। মানসীদির বিয়ে।

কল্পনায় আর একটা সুন্দর ছবি দেখতে পায় মুগ্ধা। এই পৃথিবীর কোথাও এক উৎসবের আঙ্গিনায় এক আল্পনা-আঁকা জায়গার উপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে হেমন্ত আর মানসী। শাঁক বাজছে। ফুলের মালা আর চন্দনের গন্ধে চলে পড়েছে বাতাস।

আজই হোস্টেল থেকে বিদায় নিচ্ছেন মানসীদি! ছবি-আঁকার শেষ ক্লাস শেষ ক'রতে এসে আজ মনের আনন্দে একটা নতুন কাণ্ডও ক'রছেন মানসী। ছাত্রীরা মুগ্ধ হ'য়ে আর হেসে হেসে হল্লোড় ক'রে দেখছে সেই দৃশ্য।

মানসী কাগজ আর তুলি নিয়ে একটা ছবি আঁকতে শুরু করেছে। এই ছবিকেই ছাত্রীদের উপহার দিয়ে যাবে মানসী।

মানসী বলে—সবাই এসে সামনে দাঁড়াও। আমি নতুন এক তিলোত্তমার মুখ আঁকবো।

—তার মানে?

মানসী বলে—তার মানে হ'লো, একটি সুন্দর মুখ এঁকে দিয়ে যাবো, যার মধ্যে তোমাদের সবারই মুখের সুন্দরটুকু থাকবে।

উৎসবের মুখরতা আর হাসি উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ছবি আঁকার ক্লাসে। সত্যিই আজ হাসবার দিন। মানসী আঁকছে নতুন এক তিলোত্তমার রূপের ছবি! হিমানীর নাকের গড়ন বড়ো সুন্দর। সুতরাং…।

হেসে ডাক দেয় মানসীদি—তোমার নাক দেখাও হিমানী।

হিমানী সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে। হিমানীর নাকের সুন্দর ছাঁচ তুলি দিয়ে ছবির উপর আঁকতে থাকে মানসী। একে একে আর সবাইকেও সামনে এসে দাঁড়াতে হয়। হাসির তুফান জাগে। অলকার ঠোঁট দু'টি চমৎকার। সুতরাং, ছবির মুখে ঐরকম দু'টি ঠোঁট আঁকতে হ'লো। যার যা সুন্দর, তাই দেখে নিয়ে ছবি এঁকে চলেছে মানসী। পূরবীর চুল, অনুপমার গলা, পারুলের কপাল, অনিমার চোখ, মালতীর ভুরু, আর কেতকীর চিবুক বড়ো সুন্দর।

ছবি আঁকা শেষ হয়। হঠাৎ নতুন তিলোত্তমার ছবির দিকে তাকিয়ে হাত তুলে কপালে হাত ছুঁইয়ে শিউরে শিউরে হাসতে থাকে মানসী—অ্যা, এ কী হয়ে গেলো। কী কুৎসিত…এ যে দেখতে তোমাদের মুক্তাদিরই মতন।

পূরবী আর অণিমা চমকে ওঠে।—সত্যিই যে তাই। এরকম বিশ্রী ছবি আমরা নেবো না মানসীদি?

কেউ জানতে পারেনি, এতোক্ষণ ছবি আঁকার এই হল্লোড়ের ঘরেরই দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল মুক্তা। হঠাৎ ঘরের ভিতর ঢোকে মুক্তা। মানসীর দিকে হাত এগিয়ে দিয়ে বলে—ছবিটা আমাকে দিয়ে যাও মানসী।

হিমানী অলকা আর কেতকীরা দেখে আশ্চর্য হয়, হাসছেন মুক্তাদি, আর, সেই স্যাঁতসেতে চোখ দুটোকে যেন ভালো ক'রে ধুয়ে এসেছেন। যেন এতোদিন পরে একটা ভয়ংকর কঠিন মানতের ব্রত সাঙ্গ করেছেন মুক্তাদি, তাই সকল আনন্দে বিজয়িনীর মতো হাসছেন।

———